দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার

এক

এই অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কাব্য ও নাটকগুলির আলোচনা করেছি। এই আলোচনায় আমরা কাব্যের ভাব বস্তুগত পরিচয় এবং নাটকের সঙ্গে তার যোগসূত্র, যোগসূত্রের আভাস ইত্যাদি বিষয়গুলি উদ্‌ঘাটনে মনোযোগী হব। এ ছাড়া কাব্য ও নাট্যের উপমাগত, শব্দগত অর্থাৎ প্রকাশরীতির সম্পর্ক নিরূপণ করতে সচেষ্ট হব।

'রবীন্দ্রনাট্যের অভিব্যক্তির ধারা' অধ্যায়ে আমরা প্রথম পর্যায়ের নাটকগুলির বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপন করেছি এবং পাশাপাশি আলোচনা করেছি গাথাকাব্যগুলি। (বনফুল, কবিকাহিনী, ভগ্নহৃদয়)। এই অধ্যায়ে সে কারণেই নাটকগুলির বিস্তারিত পরিচয় থাকছে না বা থাকছে না গাথাকাব্যগুলির আলোচনা। আমরা শুধুমাত্র প্রথম পর্যায়ের কাব্যগুলির পরিচয় উপস্থাপন এবং নাটকগুলির সঙ্গে তার যোগসূত্র উ দ্‌ঘাটনে মনোনিবেশ করব। কবি রবীন্দ্রনাথ এবং নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোথাও কি কোন বিরোধ রয়েছে, অথবা এ দু'য়ের মধ্যে কি কোন ভেদরেখা টানা যায়, নাকি এ পর্যায়ে কবি ও নাট্যকার মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছেন—এসবেরই অনুসন্ধান আমাদের বর্তমান অধ্যায়ে উপস্থাপিত হবে।

শেষ জীবনে "বাক্যের সৃষ্টির উপরে"[১] রবীন্দ্রনাথের সংশয় জন্মেছিল। কেননা জীবন ও জগতের অনেক বিষয়কেই প্রকাশ করা যাচ্ছে না বাক্যের সীমাবদ্ধতায়। তাই "এই টলমলে অবস্থায় এখনো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের—গান আর ছবি।"[২] কারণ, "গান যখন সম্পূর্ণ জাগে মনের মধ্যে, তখন চিত্ত অমরাবতীতে গিয়ে পৌছায়"[৩]। আর ছবিতে উঠে এসেছে অশান্ত সময়ের রক্তময় রেখা। যারা "আমার চৈতন্য-অন্তঃপুরে রেখারূপের জাদু নর্তকীরা একদিন পর্দানশীন ছিল, আজ পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছে"[৪]। এসবই হয়তো প্রকাশ করা যাচ্ছিল না 'বাক্যের সৃষ্টিতে', তাই এই সংশয়। ভাবতে অবাক লাগে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এই চিঠিতে 'বাক্যের সৃষ্টি'র প্রতি সংশয় প্রকাশ করার

কয়েক বছর আগেই তাঁর সত্তরতম জন্মদিনের ভাষণে বলেছেন, "একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র"[৫]। তবে বাক্যের সৃষ্টির উপর না হলেও কাব্যের ক্ষমতার উপর তাঁর মধ্য যৌবনে একবার সংশয় জন্মেছিল। ১৩.৭.১৮৯৩-এ সাজাদপুর থেকে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন, "এক-এক সময় মনে হয় — আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়..."[৬]। আবার ঐ চিঠিতেই লিখেছেন, "অতএব একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধে—বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সবচেয়ে বেশী ধরা দিয়েছেন—আমার ছেলেবেলাকার ভালোবাসা, আমার বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী"[৭]। আর সে কারণেই এই 'বহুকালের অনুরাগিনী সঙ্গিনী' জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি ভিন্ন পরিচয়ের সঙ্গে। নাট্যকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, চিত্রকর, সংগীতস্রষ্টা, প্রাবন্ধিক —এই প্রতিটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই জড়িয়ে আছেন, ছড়িয়ে আছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। তাই নিজেকে 'নানাখানা' করে দেখে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে, "একটি পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র"[৮]।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখার সূত্রপাত হয়েছিল কি ভাবে 'জীবনস্মৃতি' পাঠে সে খবর জানা যায়।

> আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ প্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। তিনি তখন ইংরেজী সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে কবিতা লিখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুর বেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।" বলিয়া, পয়ার ছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। ... কোনো-একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্‌সিল দিয়া কতকগুলো অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।[৯]

এই হ'ল বিশ্বকবির কবিতা লেখার সূত্রপাত। আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কালসীমা নির্দেশ করেছি ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ 'শৈশব সংগীত' থেকে 'ছবি ও গান' পর্যন্ত। আমাদের এই কালসীমা নির্দেশের পিছনে যে যুক্তি - তা হচ্ছে নাট্য-আলোচনার ক্ষেত্রেও আমাদের মূল লক্ষ্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' পর্যন্ত, যা রচিত হয় ১৮৮৪ সালে। যেহেতু প্রথম পর্যায়ের কাব্য ও নাট্যের ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যের আলোচনাই এই

অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় সেকারণেই এই সীমানা নির্দেশ। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম তাঁর নিজস্ব নাট্যরীতির সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই কাব্য ক্ষেত্রেও এই কালসীমা। যদিও নাট্য-আলোচনা 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অতিক্রম করে 'বিসর্জন' পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে কিন্তু সে সম্প্রসারণ শুধুমাত্র এই পর্বের সমগ্র নাট্যরচনাবলীর পরিচয় উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজনে অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

এই সময়-কালের মধ্যে যে কাব্যগুলি থাকছে সেগুলি হচ্ছে, 'শৈশব সঙ্গীত', সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সংগীত', ও 'ছবি ও গান'।

'ছবি ও গান' প্রকাশিত হওয়ার মাস তিনেক পর প্রকাশিতহ'ল 'শৈশব সঙ্গীত'। ''বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকায় গ্রন্থটির প্রকাশ তারিখ 29 May 1884 [বৃহ ১৭ জ্যৈষ্ঠ]-।''[১০] কিন্তু ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হলেও 'শৈশব সঙ্গীত'-এর কবিতা গুলি লেখা হয়েছিল অনেক আগেই। গ্রন্থটির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতা গুলি প্রকাশ করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশব সঙ্গীত বলা যায় কিনা সন্দেহ''[১১]।

'শৈশব সঙ্গীত'-এ ১৭টি কবিতা রয়েছে, এর মধ্যে পাঁচটি গাথা। গাথা গুলি হচ্ছে, 'ফুলবালা', 'প্রতিশোধ', 'লীলা', 'অপ্সরা-প্রেম', 'ভগ্নতরী'। ১৭টি কবিতার মধ্যে নীচের ১৩টি কবিতা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

ছিন্ন লতিকা — অগ্রহায়ণ ১২৮৪

ভারতী বন্দনা — মাঘ ১২৮৪

ফুলবালা (গাথা)—কার্তিক ১২৮৫

দিকবালা — আষাঢ় ১২৮৫

প্রতিশোধ (গাথা)—শ্রাবণ ১২৮৫

লীলা (গাথা)—আশ্বিন ১২৮৫

অপ্সরা-প্রেম (গাথা)—ফাল্গুন ১২৮৫

প্রেম মরীচিকা—ফাল্গুন ১২৮৬

ভগ্নতরী (গাথা)—আষাঢ় ১২৮৬

কামিনী ফুল —ভাদ্র ১২৮৭

গোলাপবালা —অগ্রহায়ণ ১২৮৭

হরহৃদে কালিকা — আশ্বিন ১২৮৭

পথিক — পৌষ ১২৮৭

এছাড়া অন্য চারটি কবিতা অর্থাৎ 'অতীত ও ভবিষ্যৎ', 'ফুলের ধ্যান', 'প্রভাতী', ও 'লাজময়ী' বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে 'লাজময়ী' কবিতাটি 'ভগ্নহৃদয়'-এর সপ্তম সর্গে অনিলের গান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।[১২]

'শৈশব সঙ্গীত'-এর ১৭টি কবিতার মধ্যে যে ৫টি গাথা কবিতা রয়েছে আমরা সে গুলির আলোচনা পরে করব আগে অন্য ১২টি কবিতার আলোচনা করছি।

'অতীত ও ভবিষ্যৎ' কবিতাটির সন্ধান পাওয়া যায় 'মালতীপুঁথিতে'।[১৩] 'মালতীপুঁথি'র পান্ডুলিপির 54/২৮খ পৃষ্ঠায় 'শৈশব সঙ্গীত' নামে কবিতাটি লিপিবদ্ধ আছে। কবিতাটির উপরে লেখা আছে—

বোটে লিখিয়াছি
মঙ্গলবার
২৪ আশ্বিন
১৮৭৭।

প্রবোধচন্দ্র সেন অনুমান করেছেন সম্ভবত এটাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম তারিখ দেওয়া কবিতা।[১৪] এই কবিতাটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি। পরে 'শৈশব সঙ্গীত' কাব্য গ্রন্থে 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' নামে প্রকাশিত হয়। 'ভারতী'তে যখন এই সময় রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতা ('ছিন্নলতিকা'- অগ্রহায়ণ ১২৮৪, 'ভারতীবন্দনা'-মাঘ ১২৮৪) প্রকাশিত হল তখন কেন এই কবিতাটি প্রকাশ করা হল না? প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন, ''এই কবিতাটিতে কবির সেই সময়কার অবসন্ন চিত্তের বেদনা অতি করুণ ভাবে ফুটে উঠেছে''।[১৫] এই 'অবসন্ন চিত্তের বেদনা' প্রকাশ করতে কি কোন কুণ্ঠা বোধ ছিল? হয়তো সে কারণেই প্রকাশ করা হয়নি একান্ত ব্যক্তি বেদনার চালচিত্র।

কবিতাটিতে রয়েছে অতীত সুখস্মৃতির মন্থন এবং রয়েছে অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা। আর রয়েছে বর্তমানের 'অবসন্ন চিত্তের বেদনা'র চিত্র। অতীতের স্মৃতির রোমন্থন করে কল্পনা বালাকে বলা হচ্ছে—

জানত কল্পনা বালা, কত সুখে ছেলেবেলা
সেইখানে করেছি যাপন—
সেদিন পড়িলে মনে প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে,
হু হু ক'রে ওঠে যেন মন।

বিশ্ব প্রকৃতিতে অতীতে যা ছিল এখনও তাই আছে কিন্তু কবির অন্তর বেদনায় আক্রান্ত। বর্তমানের এই করুণ পরিণতি তার ভবিষ্যৎকে এক অর্থহীন অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে।

প্রভাত এখনও আছে, এরি মধ্যে কেন তবে
আমার এমন দুরদশা —
অতীতে সুখের স্মৃতি, বর্ত্তমানে দুখজ্বালা,
ভবিষ্যতে এ কিরে কুয়াশা!
যেন এই জীবনের আঁধার সমুদ্র মাঝে
ভাসায়ে দিয়েছে জীর্ণ তরী,
এসেছি যেখান হতে অস্ফুট সে নীল তট
এখনো রয়েছে দৃষ্টি ভরি!

কিন্তু এই ভেসে যাওয়ার শেষে কি রয়েছে?

যেতেছি যেখানে ভাসি সে দিকে চাহিয়া দেখি
কিছুই ত না পাই উদ্দেশ—
আঁধার সলিলরাশি সুদূর দিগন্তে মিশে,
কোথাও না দেখি তার শেষ!
ক্ষুদ্র জীর্ণ ভগ্নতরি একাকী যাইবে ভাসি
যতদিন ডুবিয়া না যায়,
সমুখে আসন্ন ঝড়, সমুখে নিস্তব্ধ নিশি
শিহরিছে বিদ্যুৎ শিখায়।

এই কবিতা যদি আত্ম-প্রক্ষেপণ হয় তবে কি ছিল সে সময়ের অবস্থা? কি কারণে বিষাদময়তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস? এ প্রসঙ্গে আমরা তুলে আনতে পারি 'জীবনস্মৃতি'র দুটি চিত্র, যার সাহায্যে প্রমাণিত হয়ে যাবে আত্ম-প্রক্ষেপণের অভিধাটি।

১. দাদারা মাঝে মাঝে এক-আধবার চেষ্টা করিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন। আমাকে ভর্ৎসনা করাও ছাড়িয়া দিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, 'আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম, বড়ো হইলে রবি মানুষের মতো হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।" আমি বেশ বুঝিতাম,

ভদ্র সমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে কিন্তু তবু যে-বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল-জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা, তাহার নিত্য আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।[১৬]

২. বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না-আমার না-আর কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপনমনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।[১৭]

এই দুটি চিত্রই 'অতীত ও ভবিষ্যত' কবিতার আত্মপ্রক্ষেপণের বিষয়টি প্রমাণ করে দেয়। আমাদের এই যুক্তির সমর্থন মেলে প্রবোধচন্দ্র সেনের লেখায়। তিনি লিখেছেন, ''এই 'শৈশব সংগীত' (অতীত ও ভবিষ্যৎ) কবিতাটিই এই অশান্তি ও আক্ষেপের অন্যতম প্রধান নিদর্শন।''[১৮]

'অতীত ও ভবিষ্যৎ' কবিতাটির দূরাভাস যেন দেখতে পাওয়া যায় 'হরহৃদে কালিকা' কবিতাটিতে।

কে তুইলো হর-হৃদি আলো করি দাঁড়ায়ে,
ভিখারির সর্ব্বত্যাগী বুকখানি মাড়ায়ে?
নাই হোথা সুখ-আশা, বিষয়ের কামনা,
নাই হোথা সংসারের-পৃথিবীর ভাবনা।

'দিকবালা' কবিতায় 'দুর আকাশের পথ' থেকে নীচের পৃথিবীকে দেখার বর্ণনা রয়েছে। 'ছিন্নলতিকা' কবিতাটিতে ছিঁড়ে ফেলা একটি সুন্দর লতার অনুষঙ্গে কবির ব্যর্থতা বোধেরই প্রকাশ ঘটেছে। মনের সাধ, স্বপ্ন ছিন্নলতার প্রতীকে প্রকাশ পেয়েছে—

ছিন্ন-অবশেষটুকু এখনো জড়ানো বুকে -
এ লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা?

'ভারতী বন্দনা' কবিতাটি দেশবন্দনা অথবা পৃথিবীবন্দনারই কবিতা। 'ফুলের ধ্যান' কবিতায় ঊষার অপেক্ষায় ধ্যান ক'রে রাত্রি অতিবাহিত করার কথা প্রকাশ পেয়েছে—

দেখিতেছি শুধু ঊষার স্বপন,
তরুণ রবির তরুণ কিরণ,
তরুণ রবির অরুণ চরণ

জাগিছে হৃদয়-'পরি!

তাহাই স্মরিয়া ধেয়ান করিয়া

কাটাইব বিভাবরী।

'প্রভাতী', 'লাজময়ী', 'প্রেম মরীচিকা', 'গোলাপবালা'- এই কবিতাগুলিতে বিষয়বস্তু প্রেম। এখানে মান-অভিমান আছে, প্রেমকে মরীচিকা মনে হওয়ার কথা আছে, প্রেয়সীকে জাগানোর বাসনা আছে এবং নবজীবনের গান শোনাবার আকাঙ্ক্ষাও আছে—

তবে তুমি গো সজনি জাগিবেনা কি,

আমি যে তোমারি কবি।

শুন আমার কবিতা তবে,

আমি গাহিব নীরব রবে

ভবে নবজীবনের গান। (প্রভাতী)

এই গেয়ে ওঠা নবজীবনের গানের সঙ্গে প্রকৃতিও মিশে যাবে, কবির গান এবং প্রকৃতির গান মিলেমিশে সৃষ্টি হবে এক ঐকতান।

প্রভাত জলদ, প্রভাত সমীর,

প্রভাত বিহগ, প্রভাত শিশির

সমস্বরে তারা সকলে মিলি

মিশাবে মধুর তান! (প্রভাতী)

প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে ঐকতান সৃষ্টির পালা অথবা আকাঙ্ক্ষার স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছে পরে, 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'। এখানে কি তার ঈষৎ আভাস মেলে? মিলবার আকাঙ্ক্ষার আভাস যেন ধরা দিতে চায়। 'জগৎ প্লাবিয়া' গান গেয়ে বেড়ানোর খুবই সূক্ষ্ম আভাস যেন খেলে যেতে চায় ''ভবে নবজীবনের গান'' গাওয়ার মধ্যে।

'শৈশব সঙ্গীত'-এর 'পথিক' কবিতাটিতে প্রমথনাথ বিশী 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর আভাস পেয়েছেন। তাঁর মতে—

> যে সব লক্ষণের জন্য রবীন্দ্র-কাব্যের সূচনা হিসেবে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের এত প্রতিষ্ঠা তাহার সব লক্ষণই 'পথিক' কবিতাটিতে আছে। ... কবি রবীন্দ্রনাথ

যে কবি- পথিক, শিখরের সুপ্তির মধ্যে যে তিনি সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া সেই দিকে অগ্রসরশীল, দু'টি কবিতাতেই কবি-পথিকের সেই সমুদ্র-ব্যাকুলতা, পান্থজীবনের চিরচঞ্চলতা, জনতার মধ্যে থাকিয়াও নির্জনত্ব, বন্ধনকে গ্রহন করিয়াও তাহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া, রবীন্দ্রকাব্যের এ সমস্ত তত্ত্বই 'পথিক' কবিতাটিতে আছে। প্রভাত সংগীতের কবিতাটি যদি সত্যই রবীন্দ্র-কাব্যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়, তবে শৈশব সংগীতের কবিতাটি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের স্বপ্ন। এই স্বপ্নভঙ্গের স্বপ্ন পরবর্তী কাব্যে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই হিসেবে এই কবিতাটিকেই ''আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা'' বলিয়া ধরিতে হইবে।[১৯]

প্রমথনাথ বিশীর এই বক্তব্যের ভিতর থেকে একটা বিষয় খুবই পরিষ্কার হয়ে উঠছে যে 'পথিক' কবিতাটি যেন রবীন্দ্রকাব্যের আকর। তিনি এখানে রবীন্দ্রকাব্যের ভাবসম্পদের একটি তালিকাও দাঁড় করিয়েছেন। যেমন -

ক) সমুদ্র - ব্যাকুলতা।

খ) পান্থজীবনের চিরচঞ্চলতা।

গ) জনতার মধ্যে থেকেও নির্জনত্ব।

ঘ) বন্ধনকে গ্রহন করে বন্ধন থেকে উত্তীর্ণ হওয়া।

'দূর হতে' মহাসাগরের গান শোনার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'। পরবর্তীতে যে মহাসাগরকে তিনি 'মহামানব' বলে আখ্যা দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। পান্থজীবনের চিরচাঞ্চল্যের কথা প্রকাশ পেয়েছে অনেক গানে এবং কবিতায়। যেমন - 'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ', 'আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী' ইত্যাদি। জনতারমধ্যে থেকেও নির্জনত্ব অথবা বন্ধনকে গ্রহন করে বন্ধন থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা পরিষ্কার ভাবে উঠে এসেছে এই কবিতায় —

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। (৩০ নম্বর কবিতা/ নৈবেদ্য)

প্রমথনাথ বিশী চিহ্নিত এই সূত্র গুলি কতটুকু উঠে এসেছে 'পথিক' কবিতায় তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। কবিতাটি, 'প্রভাত' ও 'মধ্যাহ্ন' দুটি অংশে বিভক্ত। শুরু হয়েছে জেগে উঠবার আহ্বান দিয়ে—

উঠ, জাগ তবে - উঠ, জাগ সবে—

হের ওই হের, প্রভাত এসেছে

স্বরণ-বরণ গো!

অন্ধকারের প্রাচীর ভেদ করে সূর্য উদিত হয়েছে, চারদিক আলোয় আলোকময়। প্রভাতের আলোয় পৃথিবী হাসছে। এই দেখে —

সারা দেহে যেন অধীর পরাণ

কাঁপিছে সঘনে গো,

অধীর চরণ উঠিতে চায়

অধীর চরণ ছুটিতে চায়,

অধীর হৃদয় মম

প্রভাত বিহগ সম

নব নব গান গাহিতে গাহিতে

অরুণের পানে চাহিতে চাহিতে

উড়িবে গগনে গো!

প্রকৃতির এই আনন্দময়তার মাঝে বেরিয়ে পড়ার বাসনা জাগে। সকলে মিলে একসাথে গান গাইবার আকাঙ্ক্ষায় হৃদয়-মন উদ্বেল হয়ে ওঠে। কিন্তু কি গান গাওয়া হবে?

যাহা প্রাণ চায় তাহাই গাইব,

গাইব আমরা প্রভাতের গান,

হৃদয়ের গান, জীবনের গান—

এই প্রভাতের গান, হৃদয়ের গান, জীবনের গান গাইতে গাইতে কোথায় যাওয়া হবে? গন্তব্য কোথায়? জানা নেই সে গন্তব্য কোথায়। 'সমুখের পথ যেথা লয়ে যায়' — সেখানেই যাওয়া হবে।

কুসুম কাননে, অচল শিখরে,

নিঝর যেথায় শতধারে ঝরে,

মণিমুকতার বিরল গুহায়—

সমুখের পথ যেথা ল'য়ে যায়!

প্রভাত আলোর স্পর্শে প্রাণের এই উন্মাদনার সময়েও শক্তিহীনতার কথা, 'ভগ্ন আশা', 'ভগ্ন সুখ', 'ধূলিমাখা জীর্ণস্মৃতি'র কথা উঠে আসছে।

যদিও শকতি নাই এ দীন চরণে আর,
যদিও নাইক জ্যোতি এ পোড়া নয়নে আর,
শরীর সাধিতে নারে মন মোর যাহা চায়,
শতবার আশা করি শতবার ভেঙে যায় -...
চারিদিকে যৌবনের ভগ্ন জীর্ণ অবশেষ।
ভগ্ন আশা ভগ্ন সুখ ধূলিমাখা জীর্ণস্মৃতি।

কিন্তু এর মধ্যেও যাবার আকাঙ্ক্ষা— 'আমি যাব গো'। নতুন আশায় মেতে গান গেয়ে পথিকেরা চলেছে। সেই গান 'এ ভগ্ন প্রমোদালয়ে' প্রবেশ করে প্রতিধ্বনি তুলছে। অতীতের স্মৃতি ভিড় করে আসছে, যে স্মৃতিতে ধরা আছে 'দীপালোক', 'ফুল', 'পাখী', 'সুধামাখা কথা', 'হাঁসিমাখা আঁখি'। অতীত ছিল বর্ণময়, আনন্দে মুখরিত কিন্তু এখন সে প্রমোদালয় ভগ্ন। কঙ্কালরাশি পড়ে আছে, দীপ নিভে গেছে, ফুল শুকিয়ে গেছে, পাখী মরে গেছে। বর্তমান তাই শূন্যতায়, বেদনায় অবসিত। এর থেকে মুক্তি পাবার জন্য বার বার তাই বলতে হচ্ছে 'আমি যাব গো'। 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে অন্তর্গূঢ় বেদনার কথা। ব্যক্তিজীবনের বেদনাই বিষয় বস্তু হয়ে উঠেছে কবিতায়। এখানেও সেই বেদনাদগ্ধ রক্তময় বর্তমানের কথা এবং আনন্দ মুখরিত অতীতের কথারই প্রকাশ। এও তো সেই 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'-এর অবরুদ্ধ জীবনের উপস্থাপন এবং সেই অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য 'আমি যাব গো' বলে ধূয়া তুলতে হচ্ছে বার বার। কিন্তু কবিতার 'প্রভাতে' অংশে 'আমি যাব গো' এই আকাঙ্ক্ষা বার বার ধ্বনিত হলেও 'মধ্যাহ্ন' অংশে একবারও উচ্চারিত হয় না এই আকাঙ্ক্ষা। কেন? এখানে এসে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে —

এ পথের বাকি কত আর!
কেন চলিলাম?

'প্রভাতে' অংশে ''জানি না আমরা কোথায় যাইব'' বললেও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির আনন্দরাশির মাঝে নিজেকে মিলিয়ে দেবার কথাই ব্যক্ত হয়। কিন্তু 'মধ্যাহ্ন' অংশে এ প্রশ্ন উচ্চারিত হয় আক্ষেপের সুরে এবং এ প্রশ্নের সুরে তৈরী হয় এই চলার অর্থহীনতারই আবহ। ছেলে বেলাকার কথা মনে হচ্ছে, তরুণ আশায় মেতে উঠে যখন উচ্চারণ করা হয়েছিল—

সারা পথ আমাদের হবে না বিরহ,

মোরা সবে এক সাথে রব অহরহ।

কিন্তু অর্ধেক পথ না যেতেই বাল্য সখারা কে কোথায় চলে গেছে। তাই শ্রান্তপদে বাকী পথ একা ভ্রমণ করতে হয়েছে। আর সেই যাত্রা শেষ হয়েছে 'নিরাশ পুরিতে'। প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে —

ভগ্ন-আশা ভিত্তি 'পরে নব-আশা কেন
গড়িতে গেলাম হায় উন্মাদ হেন?

প্রথম অংশ যেখানে 'আমি যাব গো' ধূয়া শোনা যায় বার বার দ্বিতীয় অংশে পুরো বিপরীত ধূয়া উঠে আসে, 'কেন চলিলাম?' এ কারণেই প্রথম অংশ যেখানে আলোয় উদ্ভাসিত দ্বিতীয় অংশ সেখানে হতাশার অন্ধকারে জড়ানো। কবিতাটির শুরু অজস্র আলোকময়তার মধ্যে, শেষ আশা হীন অন্ধকারে। 'আমি যাব গো' ধ্বনি শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে যায় 'কেন চলিলাম'-এর অন্ধকারে। এই কি রবীন্দ্র কাব্যের মূল সুর? যা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতার গান শোনায়? রবীন্দ্রনাথের যাত্রা তো মহাসাগরের সঙ্গে মিলনের, অন্য অর্থে মহামানবের সঙ্গে মিলনের। কোথায় সেই মিলনের কথা। 'পথিক' কবিতাটি অন্যভাবে বিশ্লেষণ করে বুঝে নেয়া যেতে পারে এর গতি প্রকৃতি। আর একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে এর বিষয় বস্তুর। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এই কবিতায় রয়েছে দুটি পর্যায় একটি 'প্রভাতে' অন্যটি 'মধ্যাহ্নে'। একটু ভালভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এই দুটি পর্যায়ের মধ্যেও রয়ে গেছে আরও কিছু পর্যায়। আমরা এই পর্যায়গত ভাবে বিশ্লেষণ করে তুলে আনতে চাই কবিতার বিষয়বস্তুকে। রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চাইছেন 'পথিক'-এ। 'পথিক'-এ রয়েছে এ কোন পথিকের পথ চলার কথা। এই চলার পথটি কেমন এবং পথের শেষে কি রয়েছে, "পথের শেষ কোথায় কি আছে শেষে?" এই চলার পথে একজন পথিককে অতিক্রম করতে হচ্ছে কিছু পর্যায়। এই পর্যায়গত বিশ্লেষণে নিশ্চয় তুলে আনা যাবে ভিতরের কথাটি।

'পথিক'

প্রভাতে | **মধ্যাহ্নে**

প্রভাতে

(১) <u>ছেলে বেলা</u>	(২) <u>কৈশোর/ যৌবন</u>
প্রভাতের আলোতে	'আমি যাব গো'। চলার আকাঙ্ক্ষা।
জেগে ওঠা।	প্রভাতের গান আর জীবনের গান
প্রভাতের গান গাওয়া।	"দেখি যদি পারি তবে আমি
জীবনের গান গাওয়া।	গাব গো"।

(১) যাত্রা শুরু।
গন্তব্য জানা নেই।
পথ যেখানে নিয়ে যায়।

সকলে মিলে এক সাথে
থাকার বাসনা। একসাথে
ভ্রমণ করবার বাসনা।

(২) শক্তি নেই চরণে, চোখে জ্যোতি
নেই। মনের কামনায় শরীর
সাড়া দেয় না।
শতবার আশা করা এবং
শতবার ভেঙ্গে যাওয়া।

চারিদিকে যৌবনের ভগ্নদশা,
ভগ্ন আশা, ভগ্নসুখ, ধূলিমাখা
জীর্ণস্মৃতি।
ভগ্ন প্রমোদালয়।
অতীতের স্মৃতি জাগে—
'কত দীপালোক - কত ফুল - কত পাখী'
কত স্বপ্ন।

দীপ নিভে গেছে, ফুল
শুকিয়ে গেছে, পাখী মরে গেছে।

বীণার সব তার ছিঁড়ে গেছে, শুধু
দুটো বাকি। এখনো প্রভাতে
প্রাণ প্রফুল্ল হলে ভগ্ন বীণায়
যৌবনের গান বেজে ওঠে।

এখনো বসন্ত পাখীর গান শুনলে,
বসন্ত বাতাস প্রবাহিত হলে, দু'একটি
কিশলয় প্রস্ফুটিত হতে চায়।

তরুণ পাখী প্রভাতের বাতাসে উড়ছে।
শুষ্ক শাখায় পাখী একলা কিভাবে থাকে।

(২) সাধ যায় গান গাওয়ার কিন্তু তরুণ
কণ্ঠের সঙ্গে পুরানো কণ্ঠের কি সুর
বাজবে?

নীরব থেকে নতুনদের গান শোনার
ইচ্ছা জাগে।

এত শ্রান্তি, এত ক্লান্তি, এত বেদনা
তার পরও যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা-
"আমি যাব গো।".

মধ্যাহ্ন

১. যাত্রা পথে
নিজের
সঙ্গে কথোপকথন।
প্রশ্ন দেখা দেয় -
আর কত দূর?
শ্যামল কাননের
মরীচিকা চোখে
ভাসে।
পথের শেষ কোথা?

২. অবশ শরীর।
কেন এই যাত্রা?

ছেলেবেলার স্মৃতি।
এই যাত্রায় একসাথে
থাকার প্রতিজ্ঞার কথা
স্মরণ হয়। কিন্তু
অর্ধেক পথে কে কোথায়
চলে গেল?
দীর্ঘপথ শ্রান্ত পদে
একা ভ্রমণ।

ছেলেবেলায় যে আশা
নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল
সে যাত্রা ব্যর্থ। প্রশ্ন দেখা
দিয়েছে কেন এই যাত্রা?

৩. আবার যাত্রা।
অনেকেই সঙ্গ
ত্যাগ করে
চলে গেল।

৪. যেও না
ফেলে মোরে
বলে আকুতি
কিন্তু সঙ্গীরা
সবাই চলে গেল।

৫. সকাল বেলায় আনন্দের মধ্য দিয়ে
সকলের সঙ্গে যে যাত্রা শুরু
হয়েছিল কিন্তু সন্ধ্যায় এসে
সকলেই পরিত্যাগ করে চলে গেল।

চারিদিকে অসীম মরু, নিস্তব্ধ।
জনহীন পথ, আঁধার নেমে
আসছে। দূর্বল শরীর।
প্রশ্ন দেখা দিল, 'কেন চলিলাম'?
কিসের আমদে মেতে নিজেকে
ভুলে এই যাত্রা?

যৌবন বীণার মাঝে কেন আর
থাকা। নিজেকে মনে হচ্ছে
কলঙ্ক-ধরা একটি বেসুরো
তার।

৫. অন্তরে এখন সন্ধ্যার আঁধার
আর শীতের বাতাস।

'কেন চলিলাম'?
নিজেকে কেন ভুললাম?

আর কোথাও যাব না।
এখান থেকে উঠব না।

সকালবেলা তরুণ যাত্রী দল
যখন যাবে তখন যেন মন
নেচে না ওঠে।

প্রভাতের মুখ দেখে উল্লসিত হয়ে
সায়াহ্নকে যেন কেউ
ভুলে না যায়।

এই বিশ্লেষণের সাহায্যে নিশ্চয়ই তুলে ধরা গেছে ভিতরের কথাটিকে। এই পথিকের কথা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের কথাই হয়ে ওঠে। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক মাত্রই আমরা জেনে গেছি সেই অব্যবস্থার কালের খবরটি, "আমার পনেরো-ষোল হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত এই যে একটা সময় গিয়াছে, ইহা একটা অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল ছিল।"[১০] অথবা তারও আগে বাড়ীর সকলের আশা-ভঙ্গের কথা যখন উঠে এল লেখায় অথবা যখন লেখা হল, "বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোন দিন আমার কিছু হইবে এমন আশা না আমার না আর-কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোন কিছুর ভরসা না রাখিয়া আপন মনে কেবল কবিতার খাতা ভরাইতে লাগিলাম।"[১১] আর এই কবিতার খাতায় উঠে এল সেই ব্যক্তি জীবনের আঁধার-চিত্র। 'পথিক' কবিতা সেই ব্যর্থ জীবনের চিত্র। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন—

> আমার শিশুকালেই বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটা সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল।... তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল, তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল। তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল; চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল।[১২]

'পথিক' কবিতাটি শুরু হয়েছে এই ছেলেবেলার আনন্দ উচ্ছ্বাসময়তা এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্রতার কথা দিয়ে। যৌবনে এসে জীবন হয়ে পড়েছে অবরুদ্ধ। আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়ে গেছে

ধূলিসাৎ। কিন্তু এখান থেকে বেরিয়ে আসার বাসনা ব্যক্ত হয়েছে। যাত্রা শুরু হয়েছে কিন্তু পথ পাওয়া যায় নি, ''ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন।'' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' নিজের ব্যথিত হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসবার কথা আছে, মুক্তি পাবার কথা আছে। কিন্তু 'পথিক'-এ কোথাও কোন মুক্তির নিশানা নেই। এমনকি মুক্ত হওয়ার বাসনার কথাও নেই। আছে শুধু ব্যর্থতার বেদনার কথা। প্রমথনাথ বিশী এই কবিতাটিকে ''নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের স্বপ্ন''[২৩] বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বপ্ন কোথায়? 'প্রভাতে'র প্রথমপর্যায়ে যে প্রভাতের গান, জীবনের গান এবং হৃদয়ের গান গাওয়ার উল্লসিত বাসনা প্রকাশ পেল সেই বাসনা দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে হয়ে পড়লো নিস্তেজ। খুবই ক্লান্ত স্বরে বলে উঠতে হ'ল ''দেখি যদি পারি তবে আমি যাব গো''। দ্বিতীয় পর্যায়ে খুব ক্লান্ত স্বরে, থেমে থেমে প্রায় বিকারের পর্যায়ে যেন 'আমি যাব গো' বলে যাবার বাসনা প্রকাশ হয়ে চললো। কিন্তু সব শেষে দুঃখ-বেদনাময় জীবনে ঋদ্ধ হয়ে বলতে হ'ল —

আবার নাচিয়া যেন উঠে নারে মন!
উল্লাসে অধীর হিয়া দুখ শ্রান্তি ভুলি গিয়া
আর উঠিস না কভু করিতে ভ্রমণ।
প্রভাতের মুখ দেখি উন্মাদ হেন
ভুলিসনে— ভুলিসনে— সায়াহ্নেরে যেন!

এই কবিতায় পান্থ জীবনের ক্ষণিক চঞ্চলতা (চির চঞ্চলতা নয়) থাকলেও 'সমুদ্র ব্যাকুলতা', 'জনতার মধ্যে থাকিয়াও নির্জনত্ব', 'বন্ধনকে গ্রহণ করিয়াও তাহা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়া'র কথা কোথায়? আর এ সবের অনুপস্থিতিতে কি ভাবে এই কবিতাটিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যের ভূমিকা হিসেবে ধরতে পারি? আমাদের বিচারে 'পথিক' 'শৈশব সঙ্গীত'-এর 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' এবং সর্বোপরি 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' পর্বের কবিতা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

'ফুলবালা' গাথা কবিতা। অশোক এবং মালতীর প্রেম-বিরহ এবং মিলনের বিষয়। পরিবেশগত বিচারে আমাদের মনে পড়ে যায় 'ভগ্নহৃদয়'-এর পরিবেশকে। দু'জায়গাতেই কাননে, ফুল বনে প্রেম বিরহের কাহিনী নির্মাণ হয়েছে। 'ফুলবালা'য় কবি কল্পনা বালাকে সঙ্গে নিয়ে ফুলের কাননে বসে অশোক এবং মালতীর প্রেম-বিরহের ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে। 'প্রতিশোধ' গাথা কবিতাটি অন্যান্য গাথা কবিতা থেকে বিষয়গত ভাবে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণই এর বিষয় বস্তু। কিন্তু প্রতিশোধ শেষ পর্যন্ত নেওয়া হয় না, জয় হয় প্রেম এবং ক্ষমাশীলতার। 'রুদ্রচন্ড' নাটকের সঙ্গে 'প্রতিশোধ'-এর এক দূরগত সাদৃশ্য রয়েছে বলে আমাদের ধারনা। 'লালী' গাথা কবিতাটির বিষয় বস্তু প্রেম। বিজয় লীলাকে

ভালবাসে কিন্তু লীলা ও রণধীর একে অন্যকে ভালবাসে। এ কারণে বিজয় রণধীরকে হত্যা করতে চায়। রণধীরের সঙ্গে বিজয়ের যুদ্ধ বাধে। লীলাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিজয় তাকে মিথ্যা সংবাদ দেয় যে সে নিজ হাতে রণধীরকে হত্যা করেছে। এই দুঃখে লীলা আত্মঘাতি হয়। আর বিজয় মারা যায় রণধীরের সৈণ্যদের হাতে। একা যন্ত্রণায় জ্বলতে থাকে রণধীর। 'বনফুল' গাথা কাব্যের সঙ্গে 'লীলা'র সাদৃশ্য রয়েছে বলে আমাদের ধারণা। সেখানেও বিজয়, নীরদ ও কমলার মধ্যে হৃদয়গত ত্রিভূজ সমস্যা। এখানেও বিজয়, লীলা ও রণধীরের একই সমস্যা। দুজায়গাতেই কাজ করছে ঈর্ষা। 'বনফুলে' নীরদকে হত্যা করেছে বিজয় এবং কমলা আত্মবিসর্জন দিয়েছে। সেখানে বিজয় শেষ পর্যন্ত রয়ে গেছে একা। এখানেও মৃত্যু হল দুটো, এবং একা রইল রণধীর। 'অপ্সরা প্রেম'-এ উঠে এসেছে একাকিত্বের কথা, অন্তরের বেদনা এবং না পাওয়ার কথা। কবিতায় অপ্সরা এবং নায়ক দু'জনেই কেউ কাউকে পায়নি। এই না পাওয়ার হাহাকার পুরো কবিতাটি ছেয়ে রয়েছে। 'ভগ্নতরী' গাথা কবিতাটিতে 'ভগ্নহৃদয়'-এর মতো সর্গ-বিভাগ দেখা যায়। পাঁচটি সর্গে বিভক্ত কবিতাটি। এই কবিতাটি লেখা হয়েছিল বিলেতে (১৮৭৮ সেপ্টেম্বর - ১৮৮০ ফেব্রুয়ারি)। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''সেই শিলাসনে বসিয়া মগ্নতরী নামে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সেই খানেই সমুদ্রের জলে সেটাকে মগ্ন করিয়া দিয়া আসিলে আজ হয়তো বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারিতাম যে, সে জিনিসটি বেশ ভালোই হইয়াছিল।''[২৪] এই 'মগ্নতরী' পরে ভারতীতে 'ভগ্নতরী' হয়ে ছাপা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন—

> সেই শিলাসনে বসে যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন—তার নাম দিয়েছিলেন 'মগ্নতরী' - পরবর্তী আষাঢ় ১২৮৬-সংখ্যা ভারতী-তে সেটি 'ভগ্নতরী'/(গাথা) নামে পাঁচটি সর্গে বিভক্ত হয়ে মুদ্রিত হয়েছিল, পরে শৈশব সঙ্গীত (১২৯১) গ্রন্থে সংকলিত হয়।[২৫]

'ভগ্নতরী'তেও তিনটি নর-নারীর কাহিনী লেখা হয়েছে। অজিত, ললিতা ও সুরেশের হৃদয়গত উপাখ্যান 'ভগ্নতরী'। অন্যান্য গাথা গুলির মতোই এর বিষাদাত্মক পরিসমাপ্তি। বিষয় বস্তুগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এই পাঁচটি গাথার মধ্যে সাধর্ম রয়েছে। বিষয় বস্তু নর-নারীর প্রেম, প্রতিটিতেই হৃদয় না পাওয়ার বেদনা এবং প্রতিটির পরিসমাপ্তি বিষাদাত্মক।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশিত হয় ১৮৮২-এর পাঁচ জুলাই।[২৬] ১৮৮২ (বাংলা ১২৮৯) সালে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশিত হলেও এই গ্রন্থের কবিতা রচনার কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। প্রথমবার বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১২৮৮ সালের শেষ পর্যন্ত সময়কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সন্ধ্যা সঙ্গীতের পর্ব বলে উল্লেখ করেছেন।[২৭] তাঁর মতে, ''জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ - আষাঢ় ১২৮৮ সালের মধ্যে সন্ধ্যা সঙ্গীতের

অধিকাংশ কবিতাই রচিত হয়। প্রথম সংস্করণের পঁচিশটি কবিতার [পুরাতন কবিতা 'বিষ ও সুধা' সমেত] মধ্যে বারোটি ভারতীতে মুদ্রিত হইয়াছিল।''[২৮]

'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র আলোচনার স্বার্থে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্বে রবীন্দ্রজীবন কিভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল তার পরিচয় নেয়া খুবই প্রাসঙ্গিক কেন না যখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

> অতি অল্প বয়স থেকেই স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গে সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে। চারিদিকের অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং অভিজ্ঞতার নতুন আমদানি ও বৈচিত্র্যে রচনার পরিণতি নানা বাঁক নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে; একটা কোন ঐক্যের স্বাক্ষর তাদের সকলের মধ্যে অঙ্কিত হয়ে নিশ্চয়ই পরস্পরের আত্মীয়তার প্রমাণ দিতে থাকে।[২৯]

আমরা রবীন্দ্রনাথের বাইশ-তেইশ বছর বয়সের ''একটি অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল''[৩০]-এর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই 'অব্যবস্থার কালে' 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতা গুলি রচিত। এই সময়ের হৃদয়গত বেদনার পরিচয় মেলে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর প্রতিটি কবিতায়। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, ''সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবিতা গুলি একটু নিবিষ্ট ভাবে পড়লেই দেখা যাবে বিচিত্র মান-অভিমান বা রাগ-অনুরাগের দ্বন্দ্ব থেকে যে বিষাদ সৃষ্টি হয় তাই কবিতা গুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। তাই আগাগোড়া একটা নিরাশা ও ক্রন্দনের সুর শোনা যায়।''[৩১] এই কালে কি ছিল রবীন্দ্রনাথের দিনযাপনের গঠন প্রণালী? কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণের যন্ত্রণাময় এক নিঃসঙ্গতায় আবর্তিত তখন রবীন্দ্রনাথ। হৃদয়গত আবেগ গুলি তখন ''পরিমাণ বহির্ভূত অদ্ভুত মূর্তি ধারণ করিয়াএকটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত।[৩২] যে উদ্দেশ্যে বিলেত গিয়েছিলেন সে উদ্দেশ্য সার্থক হয়নি। বাড়ির সকলের আশাকে ধূলিস্যাৎ করে দিয়ে বিলেত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এ জন্য রবীন্দ্রনাথের আত্মগ্লানিও ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> বিলাত হইতে কিছুই-না-করিয়া কিছুই-না-হইয়া ফিরিয়া আসায় যে আত্মগ্লানি অনুভব করিতেন, তাহার সান্ত্বনাস্থল ছিল জ্যোতিদাদা ও বউঠাকুরাণী। পরমাত্মীয়দের মধ্যে পিতা কলিকাতা হইতে দূরে-দূরে থাকেন; জ্যেষ্ঠসহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথ আপনার কাব্য, দর্শন, গণিত, আলোচনায় মগ্ন; সত্যেন্দ্রনাথ দূরে বোম্বাই প্রদেশে। হেমেন্দ্রনাথ বাড়িতে থাকিলেও তাঁহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ তেমন দেখা যায় না; তাঁহার পত্নী এগারোটি ছেলেমেয়ে লইয়া নিজ

> সংসার গন্ডির মধ্যে এমনি আবিষ্ট থাকিতেন যে দেবরাদির প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর হইত কম; তাছাড়া তাঁহারা অন্য সকলের হইতে একটু পৃথক থাকিতেই ভালোবাসিতেন। আসল কথা বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ করিতে পারে এমন কেহ ছিলেন না।[৩৩]

একাকী জীবনে নিজের আবর্তে ঘুরে মরার বেদনাজাত নিঃসঙ্গতা বিশেষ করে বিলেতের বর্ণিল জীবনযাত্রা থেকে প্রত্যাগমনের ফলে এই নিঃসঙ্গতা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছিল এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কিছু না করার ও কিছু না হয়ে ওঠার আত্মগ্লানি। 'ছেলেবেলা' এবং 'জীবনস্মৃতি'-এর পাঠক মাত্রই আমরা জানি 'ভৃত্যরাজক তন্ত্রে' বেড়ে ওঠা রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকে কতটাই নিঃসঙ্গ ছিলেন। এই নিঃসঙ্গতার আদ্যোপান্ত উপস্থাপন আমরা তাঁর প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি গ্রন্থের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। এমন ধারণা করা নিশ্চয়ই অমূলক হবে না যে প্রথম পর্বের প্রতিটি রচনার একটি সাধারণ ধর্মের নাম নিঃসঙ্গতা। বেদনা বোধের এ আবছা আলোর চাদরে তাঁর সেই সময়কার প্রতিটি রচনাই আচ্ছাদিত। আর এই বেদনা বোধের উৎসারণ ভূমি হচ্ছে নিঃসঙ্গতা। তবে এই অন্ধকারময় এবং যন্ত্রণাময় আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসারও আলোকময় প্রবণতার আভাস রয়ে গেছে সে সময়ের রচনা গুলিতে।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতা গুলিতে যেমন রয়েছে আত্মনিমজ্জিত দুঃখময়তার প্রকাশ তেমনি কিছু কবিতায় আবার রয়েছে আত্মনিমজ্জিত দুঃখময় জীবন থেকে বেরিয়ে আসবার আকাঙ্ক্ষা। আমরা এই দুটি স্তরে 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'-এর কবিতা গুলিকে বিভক্ত করে এর আলোচনা করব।

যে সব কবিতায় আত্মনিমজ্জিত দুঃখময়তা প্রকাশিত সে গুলি হচ্ছে ঃ ১. সন্ধ্যা, ২. তারকার আত্মহত্যা, ৩. আশার নৈরাশ্য, ৪. পরিত্যক্ত, ৫. সুখের বিলাপ, ৬. দুঃখ আবাহন, ৭. অসহ্য ভালোবাসা, ৮. আবার, ৯. পাষাণী, ১০. দুদিন, ১১. শিশির, ১২. আমি-হারা, ১৩. গান-সমাপন, ১৪. উপহার।

যে সব কবিতায় আত্মনিমজ্জিত দুঃখময় জীবন থেকে বেরিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত সে গুলি হচ্ছে ঃ ১. হৃদয়ের গীতি ধ্বনি, ২. শান্তি গীত, ৩. হলাহল, ৪. অনুগ্রহ, ৫. পরাজয়-সংগীত, ৬. সংগ্রাম-সংগীত।

'সন্ধ্যা' কবিতায় সন্ধ্যা 'একাকিনী', 'অনন্ত আকাশ তলে' 'কেশ এলাইয়া' আপন মনে যে গান গেয়ে চলেছে, যে কথা বলে চলেছে কবি সে গান বুঝতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে —

হৃদয়ের অতিদূর দূর দূরান্তরে
মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে
উদাসী প্রবাসী যেন
তোর সাথে তোরি গান করে।

এই কবিতায় দুঃখময়তার প্রকাশ ঘটেছে। এখানে কবিও সন্ধ্যার মত একাকী।

'তারকার আত্মহত্যা' কবিতাটি প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করতে গিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন 'এই তারকা কে?'[৩৪] নিজেই তিনি উত্তর দিয়েছেন 'তারকা হইতেছেন কাদম্বরী দেবী'।[৩৫] কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার সঙ্গে এই কবিতা কতখানি সম্পর্কযুক্ত আমরা সে আলোচনায় না গিয়ে বলতে চাই যে এই কবিতাটির মধ্যেও রয়েছে এক অন্তর্লীন বেদনার প্রকাশ, এক দুঃখময়তার প্রকাশ। অশ্রুকুমার সিকদার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধারসাগরে উন্মাদের প্রায় যে তারকা 'আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি' ঝাপিয়ে পড়ে সে কখনো কাদম্বরী দেবী নয়, কবি সত্তারই প্রকাশ।"[৩৬] তাই কবিতার শেষে এসে যন্ত্রনাদগ্ধ তারাটির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে কবি বলছেন—

হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কিরে যায় তোর
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে
ওই আঁধার সাগরে
এই গভীর নিশীথে
ওই অতল আকাশে।

'আমার নৈরাশ্য' কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে, "ওরে আশা, কেন তোর হেন দীন বেশ!" কবি আশাকেই বলছেন তুমি যে সুখ-আশ্বাস আমাকে দিতে এসেছ তা তুমি নিজেই বিশ্বাস করনা। তার চেয়ে-

বলো, আশা, বসি মোর চিতে,
"আরো দু:খ হইবে বহিতে,
হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ
আর যারে হত না সহিতে,
আবার নতুন প্রাণ পেয়ে
সেও পুন থাকিবে দহিতে।"

'পরিত্যক্ত' কবিতায় দুঃখময়তা তীব্র আকার ধারণ করেছে।

চলে গেল, আর কিছু নাই কহিবার
চলে গেল, আর কিছু নাই গাহিবার।

কবিকে ফেলে সকলেই চলে গেল। কবি নিঃসঙ্গ, একাকী।

হৃদয় নিশ্বাস ছাড়ি কাঁদিয়া কহিল,
"সকলেই চলে গেল গো,
আমারেই ফেলে গেল গো"।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনা গুলি যে নৈর্ব্যক্তিক নয় একথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। তাঁর জীবনের অব্যবস্থার কালের চিত্র এই সময়কার রচনাগুলির মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। 'পরিত্যক্ত' কবিতাটি প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—

> আঘাত-অভিঘাত ব্যতীত মানুষের অসাড় মন জাগে না, এবং আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের এই কাব্য রচনার মধ্যেও সেই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁহার পত্নী হঠাৎ বেড়াইতে চলিয়া গেলে কবির মনে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহাই কি 'পরিত্যক্ত' কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে?[৩১]

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের এ অনুমান সত্যও হতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী চলে যাওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ হয়ে পড়েন পুরোপুরি ভাবে নিঃসঙ্গ। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতা একদিক দিয়ে তাঁর কাব্য রচনায় নিয়ে আসে এক বিরাট পরিবর্তন। অবশ্য এই পরিবর্তন ভাবগত নয় কাঠামোগত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> এক সময়ে জ্যোতিদাদারা দূরদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন; তেতালার ছাদের ঘরগুলি শূন্য ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জন দিনগুলি যাপন করিতাম।
>
> এই রূপে যখন আপনমনে একা ছিলাম তখন, জানিনা কেমন করিয়া, কাব্য রচনার সংস্কারের মধ্যে বেষ্টিত ছিলাম সেটা খসিয়া গেল। আমার সঙ্গীরা যে সব কবিতা ভালোবাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার

ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেষ্টা করিত, বোধ করি তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনা আপনি সেই সকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।[৩৮]

এই মুক্তি লাভের ফলেই তাঁর মনে হ'ল, ''বাঁচিয়া গেলাম, যাহা লিখিতেছি এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।''[৩৯]

'সুখের বিলাপ' কবিতায় শূন্যতার হাহাকার প্রতিধ্বনিত। কিন্তু এ হাহাকার কবির জবানীতে নয় এখানে সুখ নিজেই বিলাপে মত্ত—

হৃদয়ে একলা শুয়ে শুয়ে
সুখ শুধু এই গান গায়,
''নিতান্ত একেলা আমি যে
কেহ, কেহ, কেহ নাই হায়।''

'দুঃখ আবাহন' কবিতায় আত্ম নিমজ্জিত দুঃখ বিলাসী কবির পরিচয় মেলে। কবি আহ্বান করেছেন দুঃখকে ''আয় দুঃখ, আয় তুই,/ তোর তরে পেতেছি আসন''। এখানেও কবির নিঃসঙ্গতার কথা শোনা যাচ্ছে , কবি বলছেন, ''নিতান্ত একেলা এ হৃদয়।'' 'অসহ্য ভালোবাসা' কবিতাটির মধ্যেও অন্তরের শূন্যতার কথা উঠে এসেছে, ''প্রাণের প্রাণের মাঝে কী করিলে তোমারে গো পাই। যে ঠাঁই রয়েছে শূন্য কী করিলে সে শূন্য পুরাই!''

'আবার' নামক কবিতাতেও দুঃখ বিলাসী কবি —

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
প্রতিদিন আসে মোর পাশ।
দেখে, আমি বাতায়নে, অশ্রু ঝরে দু নয়নে
ফেলিতেছি দুঃখের নিশ্বাস।

'পাষাণী', 'দু দিন', 'শিশির', 'আমি-হারা' ইত্যাদি কবিতাগুলির মধ্যেও নিঃসঙ্গ কবি-হৃদয়ের বেদনার হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের ধারনা 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'- এর 'গান সমাপন' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সে সময়ের ব্যক্তি জীবন খুব বেশি ভাবে প্রকাশিত। কবিতাটি শুরু হয়েছে —

জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখিনি আর,
শুধু গাই গান।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতাগুলি রচনার সময় যে মানসিক অব্যবস্থার মধ্যে ছিলেন তার কথা। বিলেত থেকে কিছুই না হয়ে প্রত্যাবর্তন মানসিক শূন্যতা এবং দুঃখময়তাকে যেন আরও বেশি করে ঘনীভূত করে তুলেছে। সেই সময়ের বিষাদময়তার চালচিত্র 'গান-সমাপন' কবিতাটিতে যেন অনেক বেশি পরিমানে উপস্থিত। সেই সময়কে উপস্থাপন করে কবি জানাচ্ছেন যে গান গাওয়া ছাড়া কবি আর কিছুই শেখেন নি।

এমন মহান্ এ সংসারে
জ্ঞানরত্নরাশির মাঝারে,
আমি দীন শুধু গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই।
ভালো যদি না লাগে সে গান
ভালো সখা, তাও গাহিব না।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' শুধু আত্মনিমজ্জিত দুঃখময়তায় ভরা নয়, দুঃখময়তা থেকে বেরিয়ে আসারও প্রবণতা কিছু কবিতায় লক্ষ করা গেছে, সে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকেই কি এই নিষ্ক্রমণের চেষ্টা? নিজের আবরণ ছিন্ন করে বৃহতের সঙ্গে মিলবার আকাঙ্ক্ষা অথবা মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা কি পূর্বের কোন লেখায় ধ্বনিত হয়নি? আমরা কি স্মরণ করতে পারি না 'কবি কাহিনী'র সেই আলোকময় উক্তিটিকে "মানুষের মন চায় মানুষেরি মন"? "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে" দাঁড়ানোর যে উদাত্ত আহ্বান শুনব আমরা অনেক পরে তারই তো ইঙ্গিত রয়ে গেছে "মানুষের মন চায় মানুষেরি মন"-এর মধ্যে যা অনেক ব্যাপ্তি নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে ছড়িয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি সৃষ্টিতে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' শুধু অন্ধকারের কাব্য নয়। সেখানে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসারও প্রচেষ্টা রয়েছে। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি অতিক্রম করে প্রভাতে মিলবার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সদর স্ট্রীটের চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছানোর আগে 'বনফুল' 'কবিকাহিনী' হয়ে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ যেন তারই প্রস্তুতি চলছে।

অশ্রুকুমার সিকদার মন্তব্য করেছেন, " 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'-এ তীব্রতা পেয়েছে এই দ্বন্দ্ব।"[৪০] কিসের দ্বন্দ্ব? "নেতি-ইতির দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা ভেদ করে নিজেকে আবিষ্কার"[৪১] করা। অবরুদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আসার দ্বন্দ্ব।

'হৃদয়ের গীতিধ্বনি' কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে, "ও কী সুরে গান গাস হৃদয় আমার"? একই দুঃখভারাক্রান্ত গান কবির আর ভালো লাগছে না, তাই হৃদয়ের কাছে এই প্রশ্ন—

ভূমি-পানে চেয়ে চেয়ে,   একই গান গেয়ে গেয়ে —
দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়,
তবু গান ফুরায় না আর?

এই একই গান শোনার আকাঙ্ক্ষা আর নেই, তাই বলতে হচ্ছে "কখন থামিবি তুই, বল্ মোরে বল্ প্রাণ!" ক্লান্তিকর এই জীবন থেকে, বিষাদময় এই আবরণ থেকে এখন মুক্তি লাভই শুধু কাম্য। একারণে শেষ পর্যন্ত বলে উঠতে হয়েছে —

তবে থাম্ থাম্ ওরে প্রাণ,
পারিনে শুনিতে আর একই গান, একই গান।

'দুঃখ আবাহন' কবিতায় যেমন "আয় দুঃখ, আয় তুই/ তোর তরে পেতেছি আসন", বলে দুঃখকে আহ্বান করার আয়োজন দেখা যায় তেমনি 'শান্তিগীত' কবিতায় দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। কবিতা শুরু হয় এভাবে —

ঘুমা দুঃখ হৃদয়ের ধন,
ঘুমা তুই ঘুমারে এখন।

দুঃখময়তা এখন আর কাম্য নয় বরং সেখান থেকে মুক্তি লাভের কামনা তীব্র হয়ে উঠেছে —

তুই থাম্ দুঃখ, থাম।
তুই ঘুমা দুঃখ, ঘুমা।

'অসহ্য ভালোবাসা' কবিতায় রয়েছে 'অতি ভালোবাসা'র কথা। 'হলাহল' কবিতায় ভালোবাসার অনুভূতি পরিণত হচ্ছে হলাহলে। ভালোবাসাবাসির আত্মমগ্নতা আর ভালো লাগছে না —

এমন ক'দিন কাটে আর!
ললিত গলিত হাস, জাগরণ, দীর্ঘশ্বাস,
সোহাগ, কটাক্ষ, মান, নয়ন সলিল ধার,
মৃদু হাসি- মৃদু কথা - আদরের, উপেক্ষার -
এই শুধু , এই শুধু, দিন রাত এই শুধু —
এমন ক'দিন কাটে আর!

শুধু যেন একই আবর্তে ঘুরপাক। আর সে কারণেই ভালোবাসাকেও শেষ পর্যন্ত মনে হয় 'বিকৃত'। এই

বিকৃতির হাত থেকে তাই উদ্ধার পাওয়া একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বলতে হয় শেষ পর্যন্ত —

দূর করো, দূর করো, বিকৃত এ ভালোবাসা,
জীবন দায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয় নাশা।

এই 'হৃদয় নাশা' অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি প্রয়োজন। অশ্রুকুমার সিকদার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''আত্মনিমজ্জিত দুঃখ-বিলাস থেকে, বিচ্ছিন্নতার বেদনা থেকে আত্ম বোধের জাগরণ এই ভাবে হতে চলেছে''।[১২] 'অনুগ্রহ' কবিতায় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে বৃহতের সঙ্গে মিলবার আকাঙ্ক্ষায় —

আকাশে উঠিতে চায় প্রাণ —
আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
একটি জগতব্যাপী গান।

'পরাজয়-সংগীত' কবিতায় অনুশোচনার সুর শোনা যাচ্ছে—

সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হল
তোরি শুধু হল পরাজয়—

কিন্তু এ পরাজয় তো মেনে নেয়া যায় না। তাই নিজের প্রতি নিজের জেগে উঠবার আহ্বান—

জাগ্ জাগ্ জাগ্ ওরে, গ্রসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া,
আকাশ-গরাসী তার কায়া।

এই 'নিদারুণ শূন্যতার ছায়া'র হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসার। তাই বলতে হয়—

এই বেলা প্রাণ পণ কর্।
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোত মুখে ভাসিস নে আর।
যাহা পাস আঁকড়িয়া ধর্ —
সম্মুখে অসীম পারাবার,
সম্মুখেতে চির অমানিশি,
সম্মুখেতে মরণ বিনাশ।

গেল, গেল, বুঝি নিয়ে গেল
আবর্ত করিল বুঝি গ্রাস!

এ তো আত্মসংঘাতের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবার প্রচেষ্টা। ভালো-মন্দের বিভাজন পরিষ্কার করে, আলো-অন্ধকারের বিভাজন পরিষ্কার করে মুক্তি-পথের অন্বেষণ করা। 'পরাজয়-সংগীত'-এর আহ্বান 'সংগ্রাম-সংগীত'-এ এসে আরও তীব্রতা পেল। এখানে সরাসরি ঘোষণা করা হ'ল ''হৃদয়ের সাথে আজি/ করিব রে করিব সংগ্রাম।'' কারণ অন্ধকার পাখা বিস্তার করছে, চোখ থেকে সবই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। ফুল ফোঁটা, পাখীর গান, দিনের আলো সবই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কিছুই হচ্ছে না দেখা। চারিদিকে শুধু 'পাখার অন্ধকার'। একারণেই - ''মিছা বসে রহিব না আর''। হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাই সমস্ত কিছু ফিরিয়া নেবার আকাঙ্ক্ষা। রবিশশীতারা, সন্ধ্যা, উষা, 'পৃথিবীর শ্যামল যৌবন', কাননের ফুল, হারানো সংগীত, মৃতের জীবন সমস্ত কিছু ফিরিয়ে নিয়ে

জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন।

এবং সবশেষে

বেঁধে দেব বিজয়ের মালা
শান্তিময় ললাটে আমার।

'পরাজয়-সংগীত' এবং 'সংগ্রাম-সংগীত'-এ প্রকাশ পেল যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তা কি বাইরের কোন অভিঘাত জনিত? আমরা তো এমন কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারি না যেখানে বাইরের অভিঘাতের কোন চিহ্ন রয়ে গেছে দ্বন্দ্ব চলছিল ভিতরেই। হৃদয়-অরণ্যের অবরুদ্ধতায় ঘুরপাক খেতে খেতে কবি নিজেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই পথ খোঁজা হয়ে পড়েছিল জরুরী। অন্ধকার গুহা সদৃশ জীবন থেকে মুক্তি লাভ শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভালোবাসা, হৃদয়, দুঃখময়তা সবকিছু বিষময় হয়ে উঠেছে। মুক্তি লাভের জন্য হৃদয় তাই আকাশ স্পর্শ করতে চাইছে। নিজেকে নিয়ে রচিত হয়েছিল যে 'আপনারই আবরণ' তার দ্বার খুলে 'আনন্দ নিকেতন'-এর অন্বেষণ মুখ্য হয়ে দেখা দিল, আর এই বোঝাপড়া হল নিজের সঙ্গেই। ''আসলে ভিতরে ভিতরে জমছিল নেতির বিরুদ্ধে ইতিবাচক প্রতিবাদ''[২১]। শেষ পর্যন্ত তাই 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' শুধু মাত্র আর দুঃখময়তায় নিমজ্জিত কাব্য হিসেবে সীমাবদ্ধতার কলঙ্কময় আবর্তে পড়ে থাকে না বরং সেখান থেকে মুক্তি লাভের আলোকময়তায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এরই ভূমিতে রোপিত হয় 'প্রভাত সঙ্গীত'-এর বীজ, সর্বোপরি সদর স্ট্রীটের অভিজ্ঞতার বীজ।

'প্রভাতসংগীত' প্রকাশিত হয় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' প্রকাশের পরের বছর, অর্থাৎ১৮৮৩ সালে।[৪৪] 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর পর রচিত কবিতা গুলি স্থান পেল 'প্রভাতসংগীতে'। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'প্রভাতসংগীত'-এর বীজ রোপিত হয়েছিল 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'ই। বিশেষ করে 'পরাজয়-সংগীত' এবং 'সংগ্রাম-সংগীতে'। এই কবিতা দুটিতে অবরুদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার প্রাণপন চেষ্টা দেখা যাচ্ছে, তার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে এবং এই সংগ্রামের শেষে মুক্তি লাভ ঘটছে। এ কারণেই মোহিতকুমার সেন সম্পাদিত গ্রন্থে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্বের কবিতা গুলির নামকরণ করা হয়েছিল 'হৃদয় অরণ্য' এবং 'প্রভাতসংগীত' পর্বের কবিতা গুলি চিহ্নিত হয়েছিল 'নিষ্ক্রমণ' নামে। 'প্রভাতসংগীত' অন্ধকার থেকে আলোতে, হৃদয় অরণ্যের অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তিতে 'নিষ্ক্রমণ'-এর কাব্য, উত্তরণের কাব্য।

'প্রভাতসংগীত'-এর কবিতাগুলি আলোচনার আগে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণে আনতে চাই। এই সময়েই ঘটে গেছে সদর স্ট্রীটের অভিজ্ঞতা। কি ছিল সে অভিজ্ঞতায়?

> সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইখানে বোধ করি ফ্রি-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সেই সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।[৪৫]

এই অভিজ্ঞতায় চোখের সামনে থেকে সরে গেল পর্দা এবং প্রত্যক্ষ হল:

১. আনন্দে এবং সেই সৌন্দর্যে তরঙ্গিত বিশ্বসংসার অপরূপ মহিমায় সমাচ্ছন্ন।

২. হৃদয়ের স্তরে স্তরে জমে থাকা বিষাদের-আচ্ছাদন ভেদ করে সেখানে বিশ্বের আলো প্রবেশ করল।

৩. জগতের কোন কিছুই রইল না অপ্রিয়।

এই অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে উৎসারিত হল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এবং 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ গাঁথা হল ভাবি কালের কাব্যের ভিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''একটি অপূর্ব্ব অদ্ভুত হৃদয় স্ফূর্তির দিনে ''নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'' লিখিয়াছিলাম কিন্তু সেদিন কে জানিত এই কবিতায় আমার সমস্ত কাব্যের ভূমিকা লেখা হইতেছে।''[৪৬] সদর স্ট্রীটের এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে অনেক পরে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''আমার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।''[৪৭] আধ্যাত্মিক এখানে আত্মিক অর্থে। এই অভিজ্ঞতা আত্মমুক্তিরই পরিচয় বহন করে। এই আত্মিক মুক্তির ফলে দর্শন হল সত্যের।

> যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরাল থেকে, অমনি মনের পর্দা খুলে গেল। মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু, সে দিন সূর্যদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হলনা তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।[৪৮]

সদর স্ট্রীটের এই 'আধ্যাত্মিক' অভিজ্ঞতার পূর্বে প্রায় একই ধরনের একটি অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ লাভ করেছিলেন। তবে এই অভিজ্ঞতার স্থান এবং সময় দুটোই ছিল ভিন্ন। তখন লেখা চলছিল 'বউঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবিতা গুচ্ছ। 'জীবনস্মৃতি' থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ—

> একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাহ্নের শেষে বেড়াইতে ছিলাম। দিবাবসানের ম্লানিমার উপরে সূর্যাস্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষ ভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়া ছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্যন্ত আমার কাছে সুন্দর হইয়া

> উঠিল। আমি মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই যে তুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল এ কি কেবল মাত্র সায়াহ্নের আলোকসম্পাতের একটি জাদুমাত্র। কখনোই তা নয়। আমি বেশ দেখিতে পাইলাম, ইহার আসল কারণটি এই যে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে, আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই যখন অত্যন্ত উগ্র হইয়া ছিলাম তখন যাহা কিছুকেই দেখিতে শুনিতে ছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত করিয়া আবৃত করিয়াছি। এখন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছি বলিয়াই জগৎকে তাহার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে-স্বরূপ কখনোই তুচ্ছ নহে-তাহা আনন্দময়, সুন্দর।[৪৯]

পূর্বের অভিজ্ঞতায় স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হয়েছিল বলে, আবরণ খসে গিয়েছিল বলে সত্য ও সুন্দর দর্শন সম্ভব হয়েছিল। এখানেও লুপ্ত হল স্বাতন্ত্র্য। দিনের আলোয় আমিত্বের যে উগ্রতা ছিল, ঘনায়মান সন্ধ্যায় সেই আমিত্ব ঢাকা পড়ে গেল। এই 'আমি' অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য (individuality) সরে গেল বলেই জগৎকে দেখা গেল জগতের স্বরূপে। জগতের স্বরূপটি কী? 'তাহা আনন্দময়, সুন্দর'।

এই দুটো ঘটনায় যা অর্জন হ'ল তা হচ্ছে - জগতের সুন্দর আনন্দময় স্বরূপ, মানুষের অনির্বচনীয় সুন্দর অন্তরাত্মা এবং যে অন্তরাত্মায় রয়েছে চিরকালের মানুষ। এই উপলব্ধিজাত দর্শন থেকে আমরা তিনটি বিষয়ের রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্যাখ্যা কি তার অনুসন্ধান করতে পারি - এক. সুন্দর, দুই. চিরকালের মানুষের স্বরূপ, তিন. সত্যের স্বরূপ।

১. ''সুন্দর কাকে বলি। বাইরে যা অকিঞ্চিৎকর, যখন দেখি তার আন্তরিক অর্থ তখন দেখি সুন্দরকে। একটি গোলাপ ফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে সে সুন্দর, যে মানুষ তার কেবল পাপড়ি না, বোঁটা না, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে।''[৫০]

২. ''আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব।''[৫১]

৩. ''যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে।[৫২]

এই ত্রিমাত্রিক আত্মিক মুক্তির পর্বে লেখা হল 'প্রভাত সংগীত'-এর কবিতা গুচ্ছ। গাঁথা হয়ে গেল ভাবিকালের সাহিত্যর ভিত সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। চিরকালের মানুষ আর বিশ্বপ্রকৃতি এবং এ দু'য়ের

সত্যস্বরূপ এই নিয়ে সৃজন হয়ে চললো পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্যের বিশাল সম্ভার। সেখানে রবীন্দ্রনাথ আর individuality-এর অহং-এ বিচ্ছিন্ন নন। অনেক পরে (১৩১১) আবারও তিনি বলেছিলেন, ''আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি আমার কোন বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।

মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম মাতৃমুখ-পানে;
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।''[৫৩]

'প্রভাত সংগীত'-এ আত্মিক মুক্তির কথা কতটা গাঢ়ত্ব লাভ করেছিল? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''প্রভাত সংগীতের ঋতুতে আপনা-আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা আধটা মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় সে ফসলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনা চাষের জমিতে।''[৫৪]

নিজের অবরুদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার যে আকাঙ্ক্ষা 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'-এর 'পরাজয়-সংগীত' এবং 'সংগ্রাম-সংগীত' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছিল সেই আকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল 'প্রভাতসংগীত'-এর প্রথম কবিতা 'আহ্বান সংগীত'-এ। এখানে নিজেকে বলা হচ্ছে, ''ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট''। যে কীট নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে —

মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইল হারা।

নিজের জগতে নিজে অবরুদ্ধ অবস্থায় ''একটি রোগের মতো পড়ে থাকা''। এ জীবন থেকে মুক্তির প্রয়োজন। তাই বলতে হচ্ছে, ''আজিকে বারেক ভ্রমরের মতো/ বাহির হইয়া আয়।'' এই বের হয়ে আসার আহ্বানের পিছনে রয়েছে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষা। যে প্রকৃতি বাতাস, আলো, প্রভাত-কিরণ নিয়ে পরিপূর্ণ এবং যেখানে মানুষ একে অন্যের হাতে ধরা-ধরি করে গায় গান। বিশ্বপ্রকৃতির এই আনন্দে মিলবার জন্য সবাই যখন এগিয়ে চলেছে তখন—

তুই শুধু ওরে করিস রোদন,
ফেলিস দুখের শ্বাস!
ভূমিতে পড়িয়া আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত

আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া
সোহাগ করিস কত!

এই আত্মিক বদ্ধতা থেকে, নিজেকে নিয়ে নিজের গড়া ভুবন থেকে, সর্বোপরি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অহং থেকে মুক্তি প্রয়োজন। তাই কবিতা শেষ হয় এভাবে—

ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই,
বাহির হইয়া আয়।

'বাহির' হয়ে আসা গেল 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ। কোন এক সকালে অতিদূর আকাশ থেকে ভেসে এল 'প্রভাত বিহগের' গান। আর সেই গানের পথহারা একটি তান অন্ধকার আত্মার গুহায় প্রবেশ করে তছ্‌নছ্ করে দিল সব—

আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া
আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছুঁয়েছে আমার প্রাণ।

শুধু পথ হারা পাখির তানই নয় তার সঙ্গে প্রবেশ করেছে 'পথহারা রবিকর'। কোথাও 'আলয় না পেয়ে' রবি-কিরণ বহুদিন পর এসে প্রবেশ করলো অন্ধকার গুহায়। প্রভাত বিহগের গান এবং রবির কিরণের স্পর্শে প্রাণের আবেগ আর ধরে রাখা গেলনা এবং কি জানি কেন আজ ''জাগিয়া উঠিছে প্রাণ''। এই আত্মজাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধ হল চারিদিকে ''পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর'', বুকের উপর আঁধার বসে নিজের ধ্যান করছে। জেগে উঠবার কথা ছিল আগেই—

না জানি কেনরে এতদিন পরে
জাগিয়া উঠিছে প্রাণ।

এই জাগরণ বুঝিয়ে দিল নিজের মধ্যে নিজের আবদ্ধতা কতখানি—

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন, ''এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম।''[৫৫] এই অহং-এর

আবর্তে ঘুরে মরা অসহ্য হয়ে পড়েছিল। যন্ত্রণাদগ্ধ পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তির জন্য যে আকুল কামনা দেখা গিয়েছিল 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর শেষে, সেই কামনা বিদ্রোহের আকার ধারণ করলো এই কবিতায়। চারিদিকে এত বাঁধন দেখে তাই বলতে হল —

ভাঙ্ রে হৃদয় ভাঙ্ রে বাঁধন
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর।
মাতিয়া যখন উঠিছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠিছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর!

পাষাণ কারা ভেঙে বেরিয়ে আসার ফলে শোনা গেল মহাসাগরের গান—

'পাষাণ-বাধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারা প্রাণ ঢালি দিয়া,
জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া-
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা!'

এই 'মহাসাগর' যে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে তা কি অর্থ নিয়ে প্রকাশিত হয়ে ওঠে? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁরসঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।"[৮] এই ব্যাখ্যা অনেক পরের, যখন রবীন্দ্রনাথ ঋদ্ধ হয়েছেন তাঁর নিজস্ব দর্শনে। জগৎ, মানুষ এবং তার সত্যাসত্যের ব্যাখ্যার কুয়াশা নেই কোথাও। কিন্তু তারপরও আমরা সেই অপরিণত বয়সের অনুভূতিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করতে চাই যে, একটি বৃহতের সঙ্গে মিলবার আকাঙ্ক্ষা এবং মিলতে পারার আনন্দ। এই বৃহৎ তখন কবির কাছে ছিল বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বজগতের মানুষ। নিজের সঙ্গে নিজের নয়, নিজের সঙ্গে বিশ্বজগতের মিলনাকাঙ্ক্ষা, জগতে প্রাণ ঢেলে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। যে বিশ্বের কথা প্রভাত পাখীর গান এবং রবির কিরণের মধ্য দিয়ে কবির অন্ধকার আত্মার গুহায় প্রবেশ করেছিল।

'প্রভাত সংগীত'—এর কবিতা গুচ্ছকে তিনটি স্তরে ভাগ করে নেওয়া যায়।

ক.	নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ	খ.	অনন্ত জীবন
	প্রভাত উৎসব		অনন্ত মরণ।
	পুনর্মিলন		
	প্রতিধ্বনি	গ.	মহাস্বপ্ন
	স্রোত		সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়।
	চেয়ে থাকা		
	সাধ		
	সমাপন।		

ক-বিভাগের কবিতা গুচ্ছ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এরই সম্প্রসারিত রূপ। এই গুচ্ছেই প্রকাশিত হয়েছে 'প্রভাত সংগীত'-এর মূল সুর। খ-বিভাগের কবিতা ভিন্ন মাত্রিক হলেও সেখানে রয়েছে ক-বিভাগেরই আলোকসম্পাত। গ-বিভাগের কবিতা দুটি নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু 'প্রভাত সংগীত'-এর মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ অর্জিত বোধ 'প্রভাত উৎসব' কবিতায় আরও পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অবরুদ্ধ হৃদয়ের অর্গল খুলে গেছে, আর তাই 'জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের স্থান হয়েছে প্রাণে। এছাড়া বিশ্ব প্রকৃতিও আজ প্রাণের মাঝে আসন নিয়েছে—

এসেছে রবি শশী, এসেছে কোটি তারা,
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।
পরান পুরে গেল হরষে হল ভোর
জগতে যারা আছে সবাই প্রাণে মোর।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' অফুরন্ত প্রাণের কথা বলা হয়েছিল—

যত দেব প্রাণ বহে যাবে প্রাণ
ফুরাবে না আর প্রাণ।

এ কবিতাতেও একই কথা ঘোষণা করা হল—

পেয়েছি যত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে।

এই অফুরন্ত প্রাণে 'জগত আসে' এবং 'জগতে যায় প্রাণ' আর 'জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে এ কি গান।' জগতের সঙ্গে এই আত্মিক বন্ধনের কথা আরও গাঢ়ত্ব লাভ করে 'কড়ি ও কোমল'-এর 'প্রাণ' কবিতায়। যেখানে ঘোষণা করা হল —

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবার ইতিহাস ধরা পড়েছে 'পুনর্মিলন' কবিতায়। ছেলেবেলায় প্রকৃতির সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিল কবির তারই বিবরণ দিয়ে শুরু হয়েছে কবিতা —

সে তখন ছেলেবেলা—রজনী প্রভাত হলে,
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেম চলে;
সারি সারি নারিকেল বাগানের একপাশে,
বাতাস আকুল করে আম্রমুকুলের বাসে।

এখনও মনে পড়ে দ্বিপ্রহরে জানালার ধারে বসে থাকা। সেখান থেকে দেখা যায় গলির ধারের পুকুর এবং পুকুরের ধারের প্রাচীন বট গাছটিকে।

পুকুর গলির ধারে,
বাঁধা ঘাট একপারে—
কত লোক যায় আসে, স্নান করে, তোলে জল—

এবং তারই

পূর্বধারে বৃদ্ধ বট
মাথায় নিবিড় জট,
ফেলিয়া প্রকান্ড ছায়া দাঁড়ায়ে রহস্যময়।

ছেলেবেলায় দেখা এই দৃশ্যেরই হুবহু বিবরণ রয়েছে 'জীবনস্মৃতি'র 'ঘর ও বাহির' অংশে। এখানে যা পদ্যে বর্ণনা করা হল 'জীবনস্মৃতি'তে তাই বর্ণিত হয়েছে গদ্যে। একারণেই বলা যায় 'পুনর্মিলন'-এ পুরোপুরি ভাবে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথই প্রকাশিত হয়েছে। ছেলেবেলার এই সুখস্মৃতি বর্ণনার পরে উঠে এসেছে অবরুদ্ধ জীবনের যন্ত্রণাময় অনুভূতির অলেখ্য। যে অলেখ্য ধারণ করেছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'। ছেলেবেলার সেই বর্ণিল দিনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল—

তারপরে কী যে হল - কোথা যে গেলেম্ চলে।
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথ হারা।

হৃদয় অরণ্যের অবরুদ্ধতার মধ্যে প্রবেশ করে শুধুই একলা থাকা। সেখানে 'আমি শুধু একেলা পথিক'। একদিন এই হৃদয় অরণ্যের অন্ধকার থেকে, একলা থাকার যন্ত্রণাময়তা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হল—

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।

আত্মজাগরণ এভাবেই হয়েছে যে জগৎ এবং জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। জীবন ও জগতের সঙ্গে নিজের প্রাণের মিলনের মধ্য দিয়েই সম্ভব সত্যকার মুক্তি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীও জীবন ও জগৎ বিবিক্ত হয়ে স্বাতন্ত্র্যের জালে জড়িয়ে মুক্তি লাভ করতে চেয়েছিল কিন্তু সম্ভব হয়নি, তাকেও ফিরতে হয়েছে জীবন ও জগতে। 'পুনর্মিলন' কবিতায় তাই শেষে গিয়ে বলতে হয়—

ছাড়িবনা তোর কোল, রব হেতা অবিরাম,
তোর কাছে শিখিবরে স্নেহ,
সবারে বাসিব ভালো—কেহনা নিরাশ হবে
মোরে ভালো বাসিবে যে কেহ।

''প্রভাত সংগীতের গান থামিয়া গেল, শুধু তার দূর প্রতিধ্বনিস্বরূপ 'প্রতিধ্বনি' নামে একটি কবিতা''[৫৮] লেখা হল দার্জিলিঙে। জগতের সমস্ত গান প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে বলেই—

অয়ি প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালোবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না।

''আসল কথা হৃদয়ের মধ্যে যে - একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। যাহার জন্য ব্যাকুলতা তাহার আর কোনো নাম খুঁজিয়া না পাইয়া তাহাকে বলিয়াছি প্রতিধ্বনি...।''[৫৯] এই কবিতাটি সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন—

এই প্রতিধ্বনি কবিতাটি মহৎ ভাবের ক্ষুদ্র বীজ। সুন্দরের চেয়ে সৌন্দর্যের আকর্ষণ, সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমে পৌঁছিবার আকুতি, দৃশ্য জগতের পরপারবর্তী অসীম অদৃশ্য জগতের অনুভূতি, যে-সব ভাব রবীন্দ্রকাব্যের প্রাণবস্তু সবগুলিই গুপ্তাকারে এই কবিতায় বর্তমান।[৬০]

'স্রোত' কবিতায় জগতের স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলবার কথা প্রকাশিত হয়েছে, ''আমি তো শুধু ভেসে যাব, দেখিব চারিপাশে।'' এর পাশাপাশি রয়েছে 'এ আমির আবরণ' ছিন্ন করার বাসনা—

অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস 'আমি আমি'।
উজানে যেতে পারিবি কি সাগর পথগামী?
জগৎ পানে যাবি নে রে, আপনা-পানে যাবি—
সে যে রে মহা মরুভূমি, কী জানি কী যে পাবি।

এই আমিত্বের গন্ডি অতিক্রম করে মহাসাগরে মিলনাকাঙ্ক্ষা যে মহাসাগরকে তিনি মহামানব বলে চিহ্নিত করেছেন। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো রবীন্দ্রনাথের কবি ধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যাকে বলেছেন "Hunger of unity" [৬১] অর্থাৎ ঐক্যের ক্ষুধা। এই মিলনাকাঙ্ক্ষার কথাই প্রকাশ পেল 'স্রোত' কবিতায়, ''জগৎ হয়ে রব আমি, একেলা রহিব না।'' অথবা—

সবার সাথে আছি আমি, আমার সাথে নাই,
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।

'চেয়ে থাকা' কবিতাটিও রচিত হয়েছে individuality থেকে বেরিয়ে আসার কামনায়—

দেখিব শুধু, দেখিব শুধু
কথাটি নাহি কব।

আর—

জগতে যেন ডুবিয়া রব
হইয়া রব ভোর।

'সাধ' কবিতাটিতেও বিশ্বজগতের সঙ্গে মিলবার সাধ ব্যক্ত হয়েছে—

হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
তারার মতো উঠিতে চায়,

আপন সুখে ফুলের মতো

আকাশ পানে ফুটিতে চায়।

নতুন প্রাণ জেগে উঠেছে, নতুন গান বাজছে চারিদিকে, দুঃখের আঁধার রাত্রির অবসান হয়ে গেছে। 'সমাপন' কবিতায় তাই বলা হল—

আজ আমি কথা কহিব না।

আর আমি গান গাহিব না।

কেন? 'জগতে হয়েছে হারা প্রাণের বাসনা'। এখানেও আমিত্বের অহংকে বিসর্জন দেওয়া হল। প্রকাশ পেল জগতের সঙ্গে মিলবার বাসনা।

'অনন্ত জীবন' ও 'অনন্ত মরণ' কবিতা দুটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। 'এ জগতে কিছুই মরে না' এই একটি তত্ত্বকথা 'অনন্ত জীবন' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। 'এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে', সেই সাগরে চারিদিক থেকে জীগনের স্রোত গিয়ে মিলিত হচ্ছে। সূর্য, চন্দ্র, তারা থেকে ঝরে পড়ছে যে ধারা, জগতের সকল হাসি, গান, প্রাণ, সেই সাগরে মিশবার জন্য ছুটে চলেছে। আমরাও ছুটে চলেছি—

অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে—

সাগরে পড়িব অবশেষে।

এই সমস্ত কিছুই মিলে-মিশে রচিত হচ্ছে 'অনন্ত জীবন মহাদেশ'। তাই প্রাণকে আহ্বান করা হচ্ছে—

তাই বলি প্রাণ ওরে, গান গা পাখীর মতো,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
তুই যাবি, গান যাবে, এক সাথে ভেসে যাবে
তুই আর তোর গান গুলি।
মিশিবি সে সিন্ধু জলে অনন্ত সাগর তলে,
এক সাথে শুয়ে রবি প্রাণ,
তুই আর তোর এই গান।

'অনন্ত মরণ'-এ বলা হচ্ছে—

এ ধরণী মরণের পথ,

এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।

কিন্তু এই মরণের স্বরূপ কি রকম? মরণের মধ্য দিয়েই জীবনকে স্পর্শ করা, 'মরণ বাড়িবে যত জীবন বাড়িবে তত'। এ মরণ নিঃশেষ হয়ে যাওয়া অর্থে নয়, জীবনকে অন্য অর্থে স্পর্শ করবার জন্য। আর তাই, ''জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম''। 'অনন্ত জীবন' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, ''বিশ্বজগতে আসা এবং যাওয়া দুটোই থাকারই অন্তর্গত, ঢেউয়ের মত আলোতে ওঠা এবং অন্ধকারে নামা।''[৬২] তেমনি 'অনন্ত মরণ' সম্পর্কে বলেছেন, ''জীবন সব-কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব-কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি,- ।''[৬৩] এদুটি কবিতা তাই শেষ পর্যন্ত জীবনের কথা বলে এবং জীবনে মিলবার কথা বলে। আর সে কারণেই আমরা পূর্বে বলেছি এদুটি কবিতায় 'ক' গুচ্ছের কবিতার আলোকসম্পাত রয়েছে।

'মহাস্বপ্ন' এবং 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়' কবিতা দুটি পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক হওয়া সত্তেও 'প্রভাত সংগীতের' মূল কবিতা গুচ্ছের সঙ্গে জীবন ও জগৎ সংলগ্নতার ক্ষেত্রে সম্পর্ক যুক্ত। 'প্রভাত সংগীতে'র মূল স্রোত যেমন জীবন ও জগৎ কে ঘিরে প্রবাহিত তেমনি 'মহাস্বপ্ন' এবং 'সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়'-এ জীবন ও জগৎ প্রকাশিত। তাই শেষ পর্যন্ত এই দুটি কবিতাও যুক্ত হয়ে যায় মূল স্রোতেরই সঙ্গে।

'ছবি ও গান' প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালে। প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, ''বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ 23 Feb 1884 (শনি ১২ ফাল্গুন)[৬৪] ।'' এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ''এই গ্রন্থে প্রকাশিত ছোট ছোট কবিতা গুলি গত বৎসরে লিখিত হয় - কেবল শেষ তিনটি কবিতা পূর্বেকার লেখা, এই নিমিত্ত তাহারা কিছু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।''[৬৫] এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে 'ছবি ও গান'-এর উৎসর্গ পত্র। সেখানে লেখা হয়েছে, ''গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার / বসন্তে মালা গাঁথিলাম।'' সুতরাং বিগত বছর বলতে এখানে ১৮৮৩কেই বোঝানো হয়েছে।

১৮৮৩ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ কারোয়ারে গিয়েছিলেন ।[৬৬] সেখানেই লেখা হল 'ছবি ও গান'-এর 'পূর্নিমায়' কবিতাটি। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অনুমান করে লিখেছেন, ''কারোয়ার বাস-কালে 'নিশীথ চেতনা' নিশীথ জগৎ' 'যোগী' কবিতা গুলি লিখিত হয় বলিয়া আমাদের মনে হয়-''[৬৭] এ প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি যে, কারোয়ারে আর একটি লেখার সূচনা হয়েছিল সেটি হচ্ছে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটক। ১৮৮৩ সালের জুন মাসের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ কারোয়ার থেকে কোলকাতায় ফিরে আসেন, একথা জানিয়েছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।[৬৮] প্রশান্তকুমার পাল অবশ্য এ প্রসঙ্গে রবিজীবনীতে লিখেছেন, ''বিবাহের (২৪ অগ্র) কিছুদিন পূর্বেই তিনি কারোয়ার থেকে ফিরে আসেন।[৬৯]

কারোয়ার থেকে ফিরে এসে শুরু হ'ল 'ছবি ও গান'-এর কবিতা রচনার পালা। 'জীবনস্মৃতি'র 'ছবি ও গান' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ছবি ও গান নাম ধরিয়া আমার যে-কবিতা গুলি বাহির হইয়াছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।"[১০] এ সময় চৌরঙ্গির কাছাকাছি সার্কুলার রোডের বাগান বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন। দোতলা বাড়ির কোন এক জানালার ধারে বসে তিনি লোকালয়ের দৃশ্য দেখতেন, "তাহাদের সমস্তদিনের নানা প্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত — সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত"।[১১] এসময় "নানা জিনিসকে দেখিবার যে-দৃষ্টি সেই দৃষ্টি যেন আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল"।[১২] এই দেখা শুধু মাত্র দেখে যাওয়া নয়, "চোখ দিয়া মনের জিনিসকে ও মন দিয়া চোখের দেখাকে দেখিতে পাইবার ইচ্ছা"।[১৩] দেখবার এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে দিল কাব্য রচনার রাস্তাটিকে। শুরু হল নতুন পথ চলা। এই নতুন পথ কি বিশেষ অর্থ নিয়ে প্রকাশিত হয়ে উঠল? ক্ষুদ্রকেও বৃহৎ করে দেখা, "নিতান্ত সামান্য জিনিসকেও বিশেষ করিয়া দেখিবার একটা পালা এই ছবি ও গানে আরম্ভ হইয়াছে"।[১৪] 'প্রভাত সংগীত'-এ শেষ হয়েছে একটি পালা, নতুন পালা শুরু হ'ল 'ছবি ও গান'-এ এসে। কিন্তু এ পালা কি একেবারেই নতুন? কোন যোগসূত্র রইল না 'প্রভাত সংগীত' পর্বের সঙ্গে? একেবারেই কি বিচ্ছিন্ন? আমরা মনে করি এখানে অন্য রকম ভাবে শুরু হলেও 'ছবি ও গান' 'প্রভাত সংগীত'-এর ধারা বেয়ে এগিয়ে গেছে। অবরুদ্ধ জীবন থেকে আত্মমুক্তির পরই সম্ভব হয়েছে সামান্য জিনিসকে বিশেষ করে দেখবার প্রবণতা। 'ছবি ও গান' যেমন 'কড়ি ও কোমল'-এর ভূমিকা রচনা করে দিয়েছে,[১৫] তেমনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' 'প্রভাত সংগীত'-এর এবং 'প্রভাত সংগীত' 'ছবি ও গান'-এর ভূমিকা রচনা করেছে। অনুসন্ধানে ধরা পড়বে 'ছবি ও গান'-এর নির্মাণে কোথাও কোথাও 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ও 'প্রভাত সংগীত'-এর ছায়া পরশ রেখে যাচ্ছে। তাই রবীন্দ্রনাথ পরে প্রমথ চৌধুরীকে চিঠিতে লিখেছেন—

> তুমি ঠিকই বলেছ—'আর্তস্বর' এবং 'রাহুর প্রেম' 'ছবি ও গানে'র মধ্যে অসঙ্গত হয়েছে, এদের মধ্যে যে একটা তীব্রতা আছে অন্যান্য গানের মধুরতার সঙ্গে তার অনৈক্য হয়েছে। আরেকটা কবিতা আছে সেটা আর এক রকমে অসঙ্গত—যথা 'পোড়ো বাড়ি'।[১৬]

'আর্তস্বর', 'রাহুর প্রেম', 'পোড়ো বাড়ি' ছাড়াও 'পূর্ণিমায়', 'নিশীথ জগৎ' এবং 'নিশীথ চেতনা' কবিতা গুলিও স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। 'ছবি ও গানে'র কবিতা গুলিও দুটি অংশে তাই বিভাজিত। এই কবিতা গুলি সম্পর্কে মন্তব্য করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "এগুলির মধ্যে বহির্বিষয়ী জাগতিক চিত্র অপেক্ষা অন্তরবিষয়ী সংগ্রাম চিত্র ফুটিয়াছে বেশি"।[১৭] এই 'অন্তরবিষয়ী সংগ্রাম চিত্র'-এর পরিচয় আমরা

পেয়েছি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কিছু কবিতায় এবং 'প্রভাত সংগীত'-এর সকল কবিতায়। 'ছবি ও গান'-এর মূল বিষয় হচ্ছে দূর থেকে দেখা বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র অংকন। কিন্তু 'অন্তরবিষয়ী সংগ্রাম চিত্র'-এর কবিতাগুচ্ছকে বাদ দিলেও 'ছবি ও গান'-এ আরও দুটো ধারা রয়েছে, একটি ছবি ও অন্যটি গান, ''আমার অল্প বয়সের লেখা গুলিকে একদিন ছবি ও গান এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছিলাম। তখন আমার মনে ছিল আমার কবিতার সহজ প্রবৃত্তিই ঐ দুটি শাখায় নিজেকে প্রকাশ করা। বাইরে আমার চোখে ছবি পড়ে, অন্তরে আমি গান গাই''।[১৮] এই অন্তরের গান এবং বাইরের ছবি মিলেমিশে তৈরী হয় 'ছবি ও গান'। অর্থাৎ রূপ ও রসের মিশ্রণ। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ''সাহিত্যের যে দুটি দিক আছে —রূপ ও রস, তাহা ছবি ও গান শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে''।[১৯]

'আর্তস্বর', 'পোড়োবাড়ি', 'নিশীথ জগৎ', 'নিশীথ চেতনা'—এই কবিতা গুলি রাত্রির গভীর অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। 'আর্তস্বর' শুরু হয়েছে এই ভাবে—

শ্রাবণে গভীর নিশি দিগ্‌বিদিক আছে মিশি
মেঘেতে মেঘেতে ঘন বাঁধা,
কোথা শশী কোথা তারা মেঘারণ্যে পথ হারা
আঁধারে আঁধারে সব আঁধা।

এই চরাচর ব্যাপ্ত অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিশাচর। এই অনন্ত মহা অন্ধকারে কেউ যেন কাউকে খুঁজছে। এই খোঁজা কিসের জন্য?

তুই কি রে নিশীথিনী অন্ধকারে অনাথিনী
হারাইলি জগতেরে তোর?

জগৎকে হারিয়ে ফেলার কারণে তাই এই তুমুল আলোড়ন তুলে জগৎকে খুঁজে ফেরা।

'পোড়ো বাড়ি' কবিতার মধ্য দিয়ে নিঃসঙ্গতার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। যে বাড়ি একদিন জনকোলাহলে ছিল পূর্ণ আজ সে জীর্ণ, নিঃসঙ্গ। তার চারিদিকে কেউ নেই, সে 'একা ভাঙ্গা বাড়ি'। সন্ধ্যেবেলা ছাদে বসে থাকা কাকের ডাক, মুখ বাড়িয়ে থাকা নিবিড় আঁধার, ভগ্ন শুষ্ক দীর্ঘ দেবদারু তরু, চন্দ্রলোকে শৃগালের চিৎকার ইত্যাদি বর্ণনা পোড় বাড়ির জীর্ণতা এবং নিঃসঙ্গতাকে বেশিভাবে ঘনিভূত করেছে। এই নিঃসঙ্গতার প্রকাশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্বকে। 'নিশীথজগৎ' কবিতায় রাত্রির অন্ধকারে বসে প্রভাতের আলোর জন্য প্রতিক্ষার কথা আছে।

জন্মেছি নিশীথে আমি, তারার আলোকে
রয়েছি বসিয়া।

এই বসে থাকা আলোর জন্য, ''কবে রে প্রভাত হবে, আনন্দে বিহঙ্গগুলি/ উঠিবে গাহিয়া।''

'নিশীথ চেতনা' কবিতায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'নিশীথজগৎ' কবিতার দূরতর প্রতিধ্বনি শুনেছেন।[৮০] এখানেও অন্ধকারের কথা আছে, আছে অন্ধকারে আকাশের পানে চেয়ে জেগে বসে থাকার কথা। অন্ধকারের তলে আকাশ পূর্ণ করে স্বপ্নেরা আনাগোনা করে। স্বপ্নেরা কেউ মাথায়, কেউ কোলে, কেউবা হৃদয়ে উঁকি দিয়ে যায়, কেউবা চোখের পাতার উপর বসে দোল খায়, কেউবা মাথার উপর দিয়ে উড়ে চলে যায়। স্বপ্ন যেন চকিতে দেখা দিয়ে পালিয়ে যায়। তাই কবিকে বলতে হয়, ''অয়ি স্বপ্ন মোহময়ী, দেখা দাও একবার।'' কবির আকাঙ্ক্ষা—

স্বপ্ন, তুমি এসো কাছে, মোর মুখপানে চাও,
তোমার পাখার 'পরে মোরে তুলে লয়ে যাও।
হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ভ্রমি মোরা সারা নিশি
প্রাণে প্রাণে খেলাইয়া প্রভাতে যাইব মিশি।

আর শেষ পর্যন্ত যে কবির দিকে ফিরে তাকায় না তার প্রাণে স্বপ্ন হয়ে প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা জাগে। দিবসে যে প্রাণ উন্মোচন করে না, কথা শোনে না,গান বোঝে না রাতে তাই স্বপ্ন হয়ে তার অন্তরে প্রবেশ করবার বাসনা। স্বপ্ন হয়ে প্রবেশ করে মায়ামন্ত্রে তার প্রাণ খুলে দিয়ে গান বুঝিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ সর্বগ্রাসী ভালোবাসা বিষয়ে লেখা হয়েছিল 'অসহ্য ভালোবাসা' এবং 'হলাহল' আর 'ছবি ও গান'-এ লেখা হল 'রাহুর প্রেম'। 'অসহ্য ভালোবাসা'য় প্রকাশ পেয়েছিল কবির আকুতি। ভালোবাসার ধনকে সার্বক্ষণিক ভাবে পাবার জন্য মন পাগল প্রায়, ''প্রাণের প্রাণের মাঝে কী করিলে তোমারে গো পাই।'' 'হলাহল'-এ এসে প্রণয় সম্পর্কে সংশয় জেগেছে ''প্রণয় অমৃত একি? এযে ঘোর হলাহল—।'' প্রেম যখনই হলাহলে পরিণত হয় তখনই জাগে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা। তাই বলতে হয়—

দূর করো, দূর করো বিকৃত এ ভালোবাসা,
জীবন দায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয় নাশা। (হলাহল)

এই প্রেম থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগলেও পুনরায় এই আকাঙ্ক্ষা ফিরে আসে 'রাহুর প্রেমে'। এখানে ভালোবাসার ধনকে প্রতিমুহূর্তে রাহুর মত জড়িয়ে ফেলবার কামনা দেখা দিল। আমাকে তোমার ভালো না লাগলো তাতে কি, ''নাই-বা লাগিল তোর'', তবু আমি ''চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া।'' পাবার জন্য

এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা কেন? কারণ—

অনন্ত এ ক্ষুধা অনন্ত এ তৃষা
করিতেছে হাহাকার।

আর সে কারণেই—

ও রূপের কাছে চিরদিন তাই
এ ক্ষুধা জাগিয়া রবে!

অতৃপ্ত প্রাণের আকাঙ্ক্ষার যে ধ্বনি আমরা শুনেছিলাম 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাত সংগীত'-এ সেই ধ্বনি 'রাহুর প্রেম' কবিতাতেও বেজে উঠেছে। ঘন্টা ধ্বনি থেমে গেলেও যেমন তার রেশ থেমে যায় না তেমনি 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাত সংগীতে'র রেশ রয়ে গেছে 'ছবি ও গান'-এ, বিশেষ করে এই সব কবিতায়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ কারণে মন্তব্য করেছেন, " 'রাহুর প্রেম' কবির একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা— ইহাতে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর মনোবিকার প্রত্যাখ্যান - না - মানা প্রেমের প্রচন্ড অনুসরণ ও দুর্জয় ইচ্ছা শক্তির প্রয়োগরূপে অসাধারণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।"[৮১]

'পূর্ণিমায়' কবিতাটি লেখা হয়েছিল কারোয়ারে। এই লেখার মূলে ছিল একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন—

> সমুদ্রের মোহনার কাছে আসিয়া পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল। সেইখানে নৌকা হইতে নামিয়া বালুতটের উপর দিয়া হাঁটিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। তখন নিশীথরাত্রি, সমুদ্র নিস্তরঙ্গ, ঝাউবনের নিয়ত মর্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, সুদূর বিস্তৃত বালুকারাশির প্রান্তে তরু শ্রেণীর ছায়াপুঞ্জ নিস্পন্দ দিক্‌চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পান্ডুরনীল আকাশ তলে নিমগ্ন। এই উদার শুভ্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিয়া আমরা কয়েকটি মানুষ কালো ছায়া ফেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম ঘুমের চেয়েও কোন্ গভীরতার মধ্যে আমার ঘুম ডুবিয়া গেল। সেই রাত্রেই যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম — তাহা সুদূর প্রবাসের সেই সমুদ্রতীরের একটি বিগত রজনীর সহিত বিজড়িত।[৮২]

এই সময় লেখা কবিতাটি হচ্ছে 'পূর্ণিমায়'। উদার বিশ্বপ্রকৃতির গভীরতার মধ্যে আত্মনিমগ্নতাই 'পূর্ণিমায়'

কবিতার বিষয়বস্তু।

যাই যাই ডুবে যাই—
আরো আরো ডুবে যাই,
বিহ্বল অবশ অচেতন।

চারিদিকে কিছুই নেই। গান, কথা, শব্দ, স্পর্শ, ঘুম, জাগরণ ''কোথা কিছু নাহি জাগে''। বিশ্ব কোথায় যেন ভেসে গেছে, ''তারে যেন দেখা নাহি যায়।'' আর এই নিস্তব্ধ, দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নার প্লাবনে—

মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবিরে কোথায়।

প্রকৃতির এই বিশাল উদারতার মাঝে, মহান সৌন্দর্যের মাঝে এবং নিস্তব্ধতার মাঝে নিজের একাকিত্বও মহত্ব লাভ করে।

আত্মনিমগ্ন ভাবনার এক অপরূপ প্রকাশ রয়েছে 'ছবি ও গান'-এর 'কে?' কবিতায়। বসন্ত-বাতাসের পেলব পরশ বুলিয়ে যে প্রাণের উপর দিয়ে চলে গেল এবং শুধু চলে গেল না শত শত ফুল ফুটিয়ে দিয়ে গেল তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না শুধু তার পরশ অনুভব করা যায়। সে যেন 'অধরা-মাধুরী'। তার পরশ পেয়ে তাই আপন মনে কুসুম বনে বসে থাকতে হয়। এই সুখ অনুভূতিতে তাই—

হৃদয় আমার আকুল হল,
নয়ন আমার মুদে এল
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে!

এই সুখ স্বপ্নের প্রকাশ 'সুখ স্বপ্ন' এবং 'জাগ্রত স্বপ্ন' কবিতা দুটিতেও রয়েছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বিভিন্ন জিনিসের ছবি অংকনই 'ছবি ও গান'-এর মূল বিষয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''তুলি দিয়া ছবি আঁকিতে যদি পারিতাম তবে পটের উপর রেখা ও রঙ দিয়া উতলা মনের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম কিন্তু সে-উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ।''[৮৩] এই কথা ও ছন্দ দিয়ে আঁকা হল ছবি। যেমন—

১. ঝিকিমিকি বেলা;
গাছের ছায়া কাঁপে জলে,
সোনার কিরণ করে খেলা।...

শুধু নদীটি বহে যায় বনের ছায়া দিয়ে,
বাতাস ছুঁয়ে যায় লতারে শিহরিয়ে। (দোলা)

২. একটি মেয়ে একেলা
সাঁঝের বেলা,
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে। (একাকিনী)

৩. নবীন প্রভাত-কনক-কিরণে
নীরবে দাঁড়ায়ে গাছপালা-
কাঁপে মৃদু মৃদু কী যেন আরামে,
বায়ু বহে যায় সুধা-ঢালা। (গ্রামে)

৪. একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ
একা একটি বনফুল ফোটে-ফোটে হয়েছে,
কচি কচি পাতার মাঝে মাথা থুয়ে রয়েছে।
চারিদিকে তার গাছের ছায়া, চার দিকে তার নিষুতি,
চারিদিকে তার ঝোপে-ঝাপে আঁধার দিয়ে ঢেকেছে—
বনের সে যে স্নেহের ধন আদরিনী মেয়ে,
তারে বুকের কাছে লুকিয়ে যেন রেখেছে। (আদরিনী)

৫. মেঘের ঘটা আকাশ ভরা,
চারিদিকে আঁধার-করা,
তড়িৎ-রেখা ঝলক মেরে যায়।
শ্যামল বনের শ্যামল শিরে
মেঘের ছায়া নেমেছে রে,
মেঘের ছায়া কুঁড়ে ঘরের 'পরে
ভাঙাচোরা পথের ধারে
ঘন বাঁশের বনের ধারে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে যেন ধরে। (বাদল)

প্রতিটি কবিতায় এরকম ছবি আঁকা হয়েছে। 'স্মৃতি-প্রতিমা' কবিতায় 'শোনা যায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর সুর।

হা রে হা শৈশব মায়া   অতীত প্রাণের ছায়া,
এখনো কি আছিস হেথায়?

এখনো অতীত স্মৃতি মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে যায়। মনে পড়ে পুরানো দিনের কথা।

'ছবি ও গান'-এর সূচনা অংশে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, " 'ছবি ও গান' কড়ি ও কোমলের ভূমিকা করে দিলে"।[৮৪] এই ভূমিকায় থাকলো দূর থেকে দেখা বিভিন্ন বিষয়ের ছবি। জানালাবাসী কবিকে এক সময় নেমে আসতে হ'ল জানালা ছেড়ে। কবিতা জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ালো। কবিকে বলতে হ'ল, "আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে"।[৮৫] কিন্তু শুধু দাঁড়ানোই, ভিতরে প্রবেশ করা যায়নি। আর 'কড়ি ও কোমল', "মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র-জীবনের এই আত্মনিবেদন।"[৮৬]

বিশ্বজীবনের সঙ্গে মিলিত হবার আকাঙ্ক্ষা অথবা সীমার সঙ্গে অসীমের মিলনাকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষাবোধই রবীন্দ্র সাহিত্যেকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই এগিয়ে যাবার ক্রমিক উত্তরণ রবীন্দ্র কাব্যের প্রথম অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করেছি। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান' হয়ে 'কড়ি ও কোমল' এই উত্তরণেরই চিহ্ন রেখে যায়। তবে পূর্ণ উত্তরণ সম্ভব হয় 'মানসী'তে এসে। বুদ্ধদেব বসু 'মানসী' সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "কলা কৌশলে এবং ভাব বস্তুতেও, 'মানসী'কে রবীন্দ্রকাব্যের অণুবিশ্ব বলা যায়"।[৮৭] বুদ্ধদেব বসু আবিষ্কার করেছেন এই অণুবিশ্বে রয়েছে—

> এক তীব্র, সমগ্র দেশকাল ব্যাপী প্রেম, যার লক্ষ্য কখনো মানবী, কখনো এক অনির্ণীত ও অনির্ণেয় বিশ্বসত্তা, আর কখনো বা মানবীর মধ্যেই অনন্তের অনুভূতি, ('নিষ্ফল কামনা', 'ধ্যান', 'পূর্বকালে', 'অনন্ত প্রেম'); ঋতু রোমাঞ্চ ('একাল ও সেকাল', 'বর্ষার দিনে'); ব্যাপ্ত, বৃহৎ, তৃপ্তিহীন সেই 'বিশ্ববিষাদ', যা রোমান্টিকতার কুললক্ষণ ('নিষ্ফল কামনা', 'আকাঙ্ক্ষা', 'প্রকাশ বেদনা'); সেই ব্যর্থতা বোধের বেদনা মাধুরী, যার তীব্রতর প্রকাশ 'কল্পনা'র 'স্বপ্ন',

'খেয়া'র 'অনাবশ্যক' ('নিষ্ফল কামনা', 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি', 'মরণ স্বপ্ন'); নিজের অব্যবহিত পরিবেশের, অর্থাৎ স্বদেশের, নীতি ও আদর্শগত ক্ষুদ্রতায় যন্ত্রণা বোধ, এবং সেই সঙ্গে এক নিগূঢ় ও মেধাবী বিশ্বচেতনা ('দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি'); এই সব মূল সূত্র, যা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অফুরন্তভাবে ফিরে ফিরে এসেছে—এদের প্রথম সার্থক উচ্চারণ 'মানসী'তেই।[৮৮]

দুই

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্যায়ে ('সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান') ভাব বস্তুর একটি ক্রমিক উত্তরণ লক্ষ করা যায়। উত্তরণ ঘটে অবরুদ্ধ জীবন থেকে বৃহত্তর জীবন ও জগৎ-এ মুক্তি লাভের মধ্যে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অহং থেকে বিশ্ব জগতে মিলনের মধ্যে এই মুক্তি নিহিত। আমরা ছয়টি স্তরে এই ক্রমিক উত্তরণের চিত্র প্রত্যক্ষ করতে পারি।

১. দুঃখময়তা।
২. নিঃসঙ্গতা।
৩. অবরুদ্ধ জীবনের যন্ত্রণা।
৪. অবরুদ্ধ জীবনের যন্ত্রণাময়তা থেকে পরিত্রাণ পাবার আকাঙ্ক্ষা।
৫. অবরুদ্ধ জীবন থেকে নিষ্ক্রমণ।
৬. অন্তরে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হতে পারার আনন্দ।

এই ধারাবাহিকতার চিত্র ক্রমিক উত্তরণেরই প্রকাশ ঘটায়। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের দুঃখময়তা, নিঃসঙ্গতা, অবরুদ্ধতার যন্ত্রণা, নিষ্ক্রমণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সর্বোপরি নিষ্ক্রান্ত হতে পারার বা মহাসাগরের সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দ এই সবই তাঁর কাব্যে গাঁথা হয়ে গেছে পারস্পারিক সম্পর্কের জালে। বিষয়বস্তুর এই ক্রমপরিণতির সূত্র আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় মহৎ পরিণামের পিছনে কবির নিজের সঙ্গে যে যন্ত্রণাময় সংগ্রাম তারই কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রথমপর্যায়ের কাব্যগুলির পর্যালোচনার পিছনে বিষয়বস্তুর এই ক্রমিক উত্তরণের বিন্যাসই আমাদের কাছে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা মিলিয়ে দেখতে চাইব প্রথমপর্যায়ের নাট্য রচনার সঙ্গে কাব্যের বিষয়বস্তুগত উত্তরণের কতটুকু সাদৃশ্য রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য কবি ও নাট্যকার দুয়ের প্রেরণাগত এবং পরিণামগত ঐক্য আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান'-এ পৌছাতে কবিকে যে আত্ম-দ্বন্দ্বের মধ্যদিয়ে নিষ্ক্রমণের রাস্তা আবিষ্কার করতে হয়েছে নাট্য রচনার ক্ষেত্রে ভাববস্তুর এই ক্রমিক উত্তরণ তিনি সম্পন্ন করেছেন প্রতিটি নাটকের প্রধান চরিত্র গুলির মধ্য দিয়ে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান'-এর যে ভাঙ্গাগড়ার পর্যায় সেই ভাঙ্গাগড়ার পর্যায় প্রতিটি নাটকের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কাব্যে মুক্তি এল দীর্ঘ পথ পরিক্রমণের মধ্যে আর নাটকে সেই মুক্তির কথাই প্রকাশ পেল একটি চরিত্রের দ্বন্দ্বময়তার মধ্য দিয়ে।

'রুদ্রচন্ড' (১৮৮১) নাটকের রুদ্রচন্ড চরিত্রের ক্রমিক উত্তরণ সাধিত হয়েছে কয়েকটি ধাপে। যদিও দ্বন্দ্বময়তার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়নি এই উত্তরণ কিন্তু তবুও কিছু পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। পর্যায়গুলো এরকম —

রাজ্য থেকে বিতাড়িত > অরণ্যে আশ্রয় (নিঃসঙ্গতা) > পৃথ্বীরাজকে হত্যার সংকল্প > যন্ত্রণাময় জীবন > পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু > মানবিকতায় উত্তরণ।

রুদ্রচন্ডের উত্তরণ সম্ভব হল তখনই যখন তার আকাঙ্ক্ষার মৃত্যু হল। তখনই সে নিজের কন্যাকে ''আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা'' বলে ডাকতে পারল। আমরা 'প্রভাত সংগীত' আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের অহং-এর কথা বলেছি। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের অহং থেকে মুক্তি লাভই প্রকৃত মুক্তি। 'রুদ্রচন্ডে'ও এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অহং চূর্ণের আভাস আছে। নিজের চারিদিকে রুদ্রচন্ড যে আবরণ তৈরী করেছিল সেই আবরণ ভেদ করে নিজ কন্যাও পিতার অন্তরে প্রবেশ করতে পারেনি। আবরণ একদিন ছিন্ন হল, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের অহং হল চূর্ণ, এরই ফলশ্রুতিতে বেরিয়ে এল পিতা রুদ্রচন্ড। এই নাটকেই ধরা রইল 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান'-এর ভাববস্তুর ক্রমিক উত্তরণের ইতিহাস। যদিও এই ইতিহাস তেমন গাঢ়ত্ব নিয়ে উঠে আসেনি কিন্তু তবুও সূচনা হল এইখান থেকেই। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাববস্তুর উন্মেষ কাব্যের আগে নাটকেই শুরু হয়েছিল। সদরস্ট্রীটের অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে কাব্য ক্ষেত্রে যে আলোকময় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল সেই আলোকময়তার প্রক্ষেপণ অনেক আগেই হয়ে গেল 'রুদ্রচন্ডে'। যাকে বলা যায় অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ, অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তিতে।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ যে নিঃসঙ্গতার হাহাকার আমরা শুনতে পাই সেই নিঃসঙ্গতা এবং দুঃখময়তার কথাই প্রকাশ পেল অমিয়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে। নিঃসঙ্গতার কথা প্রকাশ পেয়েছে তার আত্মগত সংলাপের মধ্যদিয়ে।

১. আর আমি আনমনে গাহিনা ত গান,
আর আমি তরুদেহে জড়ায়ে দিই না লতা,
আর আমি ফুল তুলে গাঁথি না ত মালা! (দ্বিতীয় দৃশ্য)

২. কে জানে মনের মধ্যে কি হয়েছে মোর,
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি
বর্ষিয়া সহস্রধারে অশ্রুজল রাশি
বজ্রনাদে করিতাম আকুল বিলাপ। (ঐ)

৩.		আর ত পারিনা, শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর।
সঘনে ঘুরিছে মাথা, টলিছে চরণ। (পঞ্চম দৃশ্য)

৪.		ওগো পান্থ, কেহ নাই, কেহ নাই মোর।
অমিয়া আমার নাম, বড় শ্রান্ত আমি,
সারাদিন পথে পথে করেছি ভ্রমণ। (ঐ)

৫.		চ'লে গেল! — সকলেই চ'লে গেল গো! (দশম দৃশ্য)

'চ'লে গেল! —সকলেই চ'লে গেল গো' অমিয়ার এই সংলাপটির সঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'- এর 'পরিত্যক্ত' কবিতাটির সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।[৮৭] অমিয়া চরিত্রটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'- এর বিষয়বস্তুকে। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'- এ যেমন প্রকাশ পেয়েছে অবরুদ্ধ জীবনের কথা সেই অবরুদ্ধ জীবনেরই জীবন্ত প্রকাশ 'রুদ্রচন্ডে'র অমিয়া। কাব্যের বিষয়বস্তু প্রকাশিত হল একটি চরিত্রের কাঠামোয়। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এ যেমন রয়েছে অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তেমনি অমিয়ার মুখ থেকেই প্রকাশ পেয়েছে অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষার কথা—

বড় সাধ যায় এই নক্ষত্র মালিনী
স্তব্ধ যামিনীর সাথে মিশে যাই যদি!
মৃদুল সমীর এই, চাঁদের জোছনা,
নিশার ঘুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া!
আঁধার ভ্রূকুটিময় এই এ কানন,
সঙ্কীর্ণহৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটীর,
ভ্রূকুটির সমুখেতে দিনরাত্রিবাস,
শাসন-শকুনি এক দিনরাত্রি যেন
মাথার উপরে আছে পাখা বিছাইয়া—
এমন ক'দিন আর কাটিবে জীবন!
থেকে থেকে প্রাণ উঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
পাখী যদি হইতাম, দু-দন্ডের তরে
সুনীল আকাশে গিয়া ঊষার আলোকে
একবার প্রাণভ'রে দিতেম সাঁতার। (দ্বিতীয় দৃশ্য)

অমিয়ার এই অবরুদ্ধ জীবনে মুক্তির আলোকময় পরশ বুলিয়ে যায় চাঁদ কবি এসে। অমিয়ার কাছে চাঁদ কবি এই রকম—

এমন মুরতি আহা, সে যেন দেবতা-সম,
এমন কে আছে তারে ভাল যে না বাসে!
এই যে আঁধার বন তার পদার্পণ হ'লে
এও যেন হেসে ওঠে মনের হরষে! (দ্বিতীয় দৃশ্য)

কিন্তু অমিয়ার মুক্তি সম্ভব হয়নি। মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। এই মৃত্যু কি এক অর্থে মুক্তিরই আভাস দিয়ে যায়? মৃত্যু সম্পর্কিত ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল 'প্রভাত সংগীত'-এর 'অনন্ত মরণ' কবিতাটি দিয়ে। 'অনন্তমরণ' কবিতাটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ''মৃত্যু তাহলে কী। একরকম করে তার উত্তর এসেছিল এই যে, জীবন সব-কিছুকে রাখে আর মৃত্যু সব কিছুকে চালায়। প্রতি মুহূর্তেই মরছি আমি, আর সেই মরার ভিতর দিয়েই আমি বাঁচার রাস্তায় এগোচ্ছি, ...।''[১০] এই বিশ্বাসেরই হয়তো প্রতীকী আভাস অমিয়া চরিত্রটির মধ্যে দেখা দিয়েছিল।

'বাল্মীকি প্রতিভা' তেও (১৮৮১) অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির কথা প্রকাশ পেয়েছে। বাল্মীকির ''স্বাভাবিক মানবত্ব যেটা ঢাকা পড়েছিল অভ্যাসের কঠোরতায়। একদিন দ্বন্দ্ব ঘটল, ভিতরকার মানুষ হঠাৎ এল বাইরে।''[১১] এখানেও বাইরে বেরিয়ে আসার কথা, মুক্তির কথা। বাল্মীকির এই মুক্তি লাভের পিছনেও রয়ে গেছে কিছু পর্যায়ের অতিক্রমণ। **অরণ্যে দস্যুবৃত্তি > বালিকার দ্বারা অন্তরে করুণার সঞ্চার > যন্ত্রণাময় নিঃসঙ্গ জীবন > আত্মজাগরণ > আবরণ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা।**
এও যেন 'রুদ্রচন্ড'-এর মতো 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান'-এর ক্রমিক উত্তরণের কাঠামোয় বাঁধা। বাল্মীকিকেও নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হয়েছে।

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই—
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে? (চতুর্থ দৃশ্য)

অথবা

জীবনের কিছু হল না হায়—
হল না গো, হল না হায় হায়! (পঞ্চম দৃশ্য)

এই আক্ষেপ যেন 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবির সুর। কাব্যে গীতিকবিতার কাঠামোয় আত্ম-প্রক্ষেপণের যে ভাব প্রকাশ পেল নাটকে এসে সেই বিষয়বস্তুরই উৎসারণ হয়ে চললো নাট্য চরিত্রের ভিতর দিয়ে।

'কালমৃগয়া' (১৮৮২) নাটকে অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির কথা'নেই। কিন্তু সেখানেও রয়ে গেছে মৃত্যু এবং দুঃখময়তার কথা। বিষয়বস্তুগত এই দুঃখময়তা মিলে যায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্বের কবিতার সঙ্গে।

'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) ও 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) একই সময়ে রচিত হয়। সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, '' 'ছবি ও গানে'র মতই রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যটি রচনা করেন তাঁর কারোয়ার বাসের পর্বে। ভাবের দিক থেকেও তাতে লেগেছে ছবি ও গানের স্পর্শ।''[১২] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' ও 'ছবি ও গান'-এর সাদৃশ্য উল্লেখ করে নীহাররঞ্জন রায় একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ''এই নাটকটি কথার তুলিতে আঁকা ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়; টুকরা টুকরা ছবি যেন একটি মালায় গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। 'ছবি ও গান'ও ঠিক এই কথার রেখায় টানা ছবি।''[১৩]

এই গ্রন্থ দুটি প্রকাশের পূর্বেই ঘটে গেছে সদর স্ট্রীটের অভিজ্ঞতা এবং এই অভিজ্ঞতার অভিঘাতেই রচিত হয়েছে 'প্রভাত সংগীত'-এর কবিতাগুচ্ছ। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সদর স্ট্রীটের আত্মজাগরণ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, তার জন্য প্রস্তুতি চলছিল আগে থেকেই। অবরুদ্ধ জীবনের যন্ত্রণার কথা এবং পাশাপাশি এই জীবন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এরই চিত্র ধরা পড়েছে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাত সংগীত'-এ। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''জীবনের প্রথম বয়স কেটেছে বন্ধঘরে নিঃসঙ্গ নির্জনে। সন্ধ্যাসঙ্গীত এবং প্রভাত সংগীতের অনেকটা সেই অবরুদ্ধ আলোকের কবিতা। নিজের মনের ভাবনা নিজের মনের প্রাচীরের মধ্যে প্রতিহত হয়ে আলোড়িত''।[১৪] 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্তির নাটক। 'জীবনস্মৃতি'তে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন একদিন আমার অন্তরের একটি অনির্দেশ্যতাময়, অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলাম, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটি একটু অন্যরকম করিয়া লিখিত হইয়াছে।[১৫]

সন্ন্যাসী জীবন ও জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে গুহার অন্ধকারে অহং-এর সাধনা করেছে কিন্তু সেই অহং-এর আবরণ একদিন ছিন্ন করে তাকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হ'ল। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'ছবি ও গান'-এর মুক্ত জগতে পৌঁছাতে কবিকে যে পর্যায়গুলি অতিক্রম করতে হয়েছে 'রুদ্রচন্ড' এবং

'বাল্মীকি প্রতিভা'তে আমরা দেখেছি সেই পর্যায়গুলি একটি নাটকের মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'ও সেই উত্তরণের ইতিহাস ধরা পড়েছে নাট্য কাঠামোয়।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর কবি অবরুদ্ধ জীবনের অন্ধকার গুহায় আবদ্ধ ছিল। সেখানে একদিন এলো প্রভাত পাখির গান, এবং সূর্যের আলো। জগৎ ও জীবনের সঙ্গে কবির অবরুদ্ধ আত্মার মিলন হল। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর সন্ন্যাসীও বিশ্বজগত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে গুহার অন্ধকারে আশ্রয় নিয়েছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই সন্ন্যাসী তার আত্মপরিচয় উপস্থাপন করছে—

আঁধারে গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে বসে আছি আপনি অটল।

একাকী এই অবস্থান ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অহং-এরই কথা বলে। গুহা এই অহং-এর আবরণের প্রতীক। কিন্তু এই অহং-এরও প্রাচীর একদিন ভেঙ্গে গেল। রঘুর দুহিতা অন্ধকার গুহায় একদিন আলো ফেলে সন্ন্যাসীর জীবন বিবিক্ত ধ্যান ভঙ্গ করে দিল। সন্ন্যাসীর অন্তরে দ্বন্দ্ব শুরু হল এবং এই দ্বন্দ্বের মধ্য থেকেই এলো মুক্তি। কাব্যেও রয়েছে মুক্তির কথা, অবরুদ্ধ অরণ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার কথা। এই নিষ্ক্রমণের কথা কবিতায় বলা হল এভাবে—

আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে
আনন্দের সমুদ্রতীরে। (পুনর্মিলন/ প্রভাত সংগীত)

'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর চতুর্দশ দৃশ্যের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে যে সন্ন্যাসী অরণ্য থেকে ছুটে বের হয়ে এসে বলছে, ''যাক, রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত''। এর আগের দৃশ্যেই রয়েছে যন্ত্রণাময় আত্মদ্বন্দ্বের কথা। সেই আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যদিয়েই মুক্তি এলো। চারিদিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাসী বলে উঠলো ''আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়।'' 'পুনর্মিলন' কবিতাতেও লেখা হল একই কথা—

সহসা দেখিনু রবিকর
সহসা শুনিনু কতগান।
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।

সন্ন্যাসী তার রচিত আবরণের অর্থহীনতা বুঝতে পেরে বলেছে—

আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত-আলোক
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে। (চতুর্দশ দৃশ্য)

প্রায় একই কথা শোনা যাচ্ছে কবিতাতে—

ভালোবাসা খুঁজিবারে গেছিনু অরণ্যমাঝে,
হৃদয়ে হইনু পথহারা,
বরষিনু অশ্রু বারিধারা। (পুনর্মিলন)

অবরুদ্ধ জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জগতের আনন্দময়তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। এই উদ্ভাসনের কথা লেখা হল কবিতায়, নাটকে এবং 'জীবনস্মৃতি'র পাতায়। 'প্রভাত সংগীত'-এর 'প্রভাত উৎসব' কবিতায় লেখা হল—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শতশত
আসিছে প্রানে মোর, হাসিছে গলাগলি।

আত্মজাগরণের পর সন্ন্যাসীও বলে উঠলেন—

আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়।
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিয়াছে।
নদী তরুলতা পাখি হাসিছে প্রভাতে।
উঠিয়াছে লোকজন প্রভাত হেরিয়া,
হাসিমুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।
ওই—যে পুজার তরে তুলিতেছে ফুল;
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধুলায় বসে খেলা করিতেছে,
সখরা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা। (চতুর্দশ দৃশ্য)

সদর স্ট্রীটের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে আত্মজাগরণ ঘটল রবীন্দ্রনাথের তাঁরই কথা লেখা হল 'জীবনস্মৃতি' র পাতায়—

> আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতাম, রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গি, শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে ভারি আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইত; সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া চলিয়াছে। শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিয়া এক যুবক যখন আর এক যুবকের কাঁধে হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত সেটাকে আমি সামান্য ঘটনা বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না—বিশ্বজগতের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যে অফুরান রসের উৎস চারিদিকে হাসির ঝরনা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দেখিতে পাইতাম।[১৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই পর্বের কাব্য ও নাট্যে একটি মেলবন্ধন রচনা হয়ে গেছে। একই বিষয় বস্তুর প্রকাশ হয়ে চলেছে পাশাপাশি। কাব্য ও নাটকে এ ই বিষয় বস্তুটি হচ্ছে আত্মঅবরুদ্ধতা থেকে মুক্তি। রূপকল্প বা ফর্ম পৃথক, কিন্তু অন্তর্নিহিত থীম্ সদৃশ।

এই পর্বে কাব্য ও নাট্যের প্রকাশ রীতিরও সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। একই ধরনের শব্দের প্রকাশ হয়ে চলেছে দু'জায়গাতেই। শব্দের প্রতীকী প্রয়োগও একই রকম। 'অরণ্য', 'গুহা', 'আঁধার' জীবনের অবরুদ্ধতা, দুঃখময়তার প্রতীক রূপে উঠে আসছে নাটকে ও কাব্যে। 'রুদ্রচন্ড', 'বাল্মীকি প্রতিভা' এবং 'কালমৃগয়া'য় নাট্য ঘটনার স্থান অরণ্য। 'রুদ্রচন্ড'-এ যদিও পর্বতগুহা এবং পথ দৃশ্য পট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তবুও অরণ্য এই নাটকের মূল দৃশ্যপট। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'ও রয়েছে একটি অরণ্যের দৃশ্য। কাব্যে 'অরণ্য' প্রতীকী আভাস নিয়ে আসছে। যেমন, ''হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে'' (আমি হারা, সন্ধ্যাসঙ্গীত), ''হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে'' (পুনর্মিলন, প্রভাত সংগীত), ''আজিকে একটি পাখি পথ দেখাইয়া মোরে/ আনিল এ অরণ্য বাহিরে'' (পুনর্মিলন, প্রভাত সংগীত)। কাব্যে ও নাট্যে 'আঁধার'-এর অনুষঙ্গ এসেছে বহুবার। কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—, ''আজি চারিদিকে মোর এ কী অন্ধকার ঘোর'' (আমিহারা, সন্ধ্যাসঙ্গীত), ''জগতের ললাট হইতে/ আঁধার করিব প্রক্ষালণ'' (সংগ্রাম সংগীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত), ''আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া'' (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, প্রভাত সংগীত), ''জাগিয়া দেখিনু আঁধারে রয়েছি আধা'' (নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ, প্রভাত সংগীত), ''আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে'' (পুনর্মিলন,

প্রভাত সংগীত), "যেন এই জীবনের আঁধার সমুদ্র মাঝে" (অতীত ও ভবিষ্যৎ, শৈশব সঙ্গীত), বনের আঁধার চিন্তা দিস ভাঙ্গাইয়া" (রুদ্রচন্ড, দ্বিতীয় দৃশ্য), আঁধার ভ্রূকুটিয়া এই এ কানন" (রুদ্রচন্ড, দ্বিতীয় দৃশ্য), "আঁধার চৌদিক হতে আছে গ্রাস করি" (রুদ্রচন্ড, তৃতীয় দৃশ্য), "ঘোর অন্ধকার মাঝে একী জ্যোতি ভায়!" (বাল্মীকি প্রতিভা, পঞ্চম দৃশ্য), "অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে" (বাল্মীকি প্রতিভা, ষষ্ঠ দৃশ্য), "দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস ফেলিয়া" (প্রকৃতির প্রতিশোধ, প্রথম দৃশ্য), "এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে" (প্রকৃতির প্রতিশোধ, দ্বিতীয় দৃশ্য), "কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে" (প্রকৃতির প্রতিশোধ, চতুর্দশ দৃশ্য)। 'গুহা' দৃশ্যপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে 'রুদ্রচন্ড' ও 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এ গুহা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে। 'প্রভাত সংগীতে'র কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে গুহার অনুষঙ্গ। এই ব্যবহারেও যুক্ত হয়েছে প্রতীকী মাত্রা। যেমন—

১. কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান। (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

২. বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা (ঐ)

৩. দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোনে। (ঐ)

৪. না জানি কী গুহার মাঝারে (প্রতিধ্বনি)

কবিতায় বা নাটকে যে সব উপমা বা ইমেজ উঠে আসে তার মধ্যে রচনার প্রসঙ্গ বা থীম প্রতিবিম্বিত হয়। সবসময় যে জ্ঞাতসারে হয় তা নয় অনেক সময় রচয়িতার অজ্ঞাতেও ঘটতে পারে। ঘটতে পারে কারণ বিষয় বা প্রসঙ্গের অপ্রতিরোধ্য টানেই এই সব উপমা, উৎপ্রেক্ষা বা ইমেজের আবির্ভাব হয়। কবি জীবনের একই উৎস থেকে উঠে এসেছিল এই সব প্রসঙ্গ অথবা ভাবনা। একাকিত্ব থেকে সংযোগের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে অভিযানের ভাবনা। ভাবনা একই, কখনো তাকে রবীন্দ্রনাথ নাট্য চরিত্রের মধ্যদিয়ে পরোক্ষ ভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এই পরোক্ষতাও প্রায় প্রত্যক্ষতার নামান্তর কেননা নাট্য চরিত্রগুলি আসলে স্রষ্টারই কল্পিত স্বরূপ, যেন চরিত্রের মুখোশ পড়ে স্রষ্টাই আড়াল থেকে কথা বলছেন। অন্য দিকে এই সব ভাবনা কবি সরাসরি নিজের জবানীতে বলেছেন গীতিকবিতায়। নাট্যচরিত্রের মধ্যে আছে, এলিয়টের ভাষায় কবির second voice, আর সমকালে রচিত গীতিকবিতা গুলিতে আছে কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের first voice।[১৭]

নির্দেশিকা

১. "বাক্যের সৃষ্টির উপরে আমার সংশয় জন্মে গেছে। এত রকম চল্‌তি খেয়ালের উপর তার দর যাচাই হয়, খুঁজে পাইনে তাঁর মূল্যের আদর্শ।"—১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯।— অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। *চিঠিপত্র* - ১১, বিশ্বভারতী, প্রকাশ আষাঢ়: ১৩৮১। পৃ: ২২৪।

২. ঐ, পৃ: ২২৯।

৩. ঐ, পৃ: ২৩০।

৪. ঐ, পৃ: ২৩৩।

৫. "নানা-খানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘচক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায় কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" — *আত্মপরিচয়*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ, সংস্করণ চৈত্র ১৪০০। পৃ: ৭৩।

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *ছিন্নপত্রাবলী*। নূতন সংস্করণ চৈত্র ১৩৯৯। বিশ্বভারতী ।পৃ: ১৬২।

৭. ঐ, পৃ: ১৬৩।

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *আত্মপরিচয়*। পৃ: ৭৩।

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কবিতা-রচনারম্ভ', *জীবনস্মৃতি*। বৈশাখ ১৪০১। বিশ্বভারতী । পৃ: ২৭ -২৮।

১০. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড। প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯০। কলকাতা। পৃ: ২০৯।

১১. ভূমিকা, *শৈশব সঙ্গীত*, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অচলিত সংগ্রহ: প্রথম খন্ড। বিশ্বভারতী । মাঘ ১৩৯২।

১২. আমরা এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছি *রবীন্দ্র রচনাবলী* (বিশ্বভারতী), অচলিত সংগ্রহের (প্রথম খন্ড) গ্রন্থ পরিচয়ের 'শৈশব সঙ্গীত' অংশ থেকে।

১৩. *রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা* - প্রথম খন্ড। সম্পাদক - শ্রী বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, ১৯৬৫। বিশ্বভারতী।

১৪. সেন, প্রবোধচন্দ্র, 'মালতীপুঁথি/পান্ডুলিপি পরিচয়', *ভোরের পাখী ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। সম্পাদনা গার্গী দত্ত। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ১৯৯৮। পৃঃ ৬৯।

১৫. ঐ, পৃঃ ৭১।

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃঃ ৬৮।

১৭. ঐ, পৃঃ ৮১।

১৮. সেন, প্রবোধচন্দ্র, 'মালতীপুঁথি/পান্ডুলিপি পরিচয়', *ভোরের পাখী ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। পৃঃ ৭১।

১৯. বিশী, শ্রী প্রমথনাথ, *রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। তৃতীয় পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৮১। পৃঃ ৩৫৯-৬০।

২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃঃ ১০৮।

২১. ঐ, পৃঃ ৮১।

২২. ঐ, পৃঃ ১৩৫।

২৩. বিশী, শ্রী প্রমথনাথ, *রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ*। পৃঃ ৩৬০।

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃঃ ৯৯।

২৫. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড। পৃঃ ৩৬।

২৬. ''বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ 5 Jul 1882 [বুধ ২২ আষাঢ়]...।'' — *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড, প্রশান্তকুমার পাল। পৃঃ ১৫০।

২৭. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* — ১ম খন্ড, বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৩৯২। পৃঃ ১১৬।

২৮. ঐ, পৃঃ ১১৭।

২৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, *রবীন্দ্ররচনাবলী*-১ম খন্ড, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬। পৃঃ ।।/০।

৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃঃ ১০৮।

৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা, *রবীন্দ্র সাহিত্যের আদিপর্ব*, এস,.গুপ্ত এন্ড ব্রাদার্স, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৫ এপ্রিল ১৯৭৮। পৃ: ১৯০।

৩২. ঐ, পৃ: ১০৮।

৩৩. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* — প্রথম খন্ড। পৃ: ১২০।

৩৪. ঐ, পৃ: ১১৮।

৩৫. ঐ, পৃ: ১১৯।

৩৬. সিকদার, অশ্রুকুমার, 'খেদের গান', *রাতের তারা দিনের রবি*, সম্পাদনা - উজ্জলকুমার মজুমদার, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, প্রথম সংস্করণ: ১লা বৈশাখ ১৩৯৫। পৃ: ৮৮।

৩৭. ঐ, পৃ: ১২৩।

৩৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১২০।

৩৯. ঐ।

৪০. সিকদার, অশ্রুকুমার, 'খেদের গান', *রাতের তারা দিনের রবি*, সম্পাদনা - উজ্জলকুমার মজুমদার। পৃ: ৯০।

৪১. ঐ, পৃ: ৯১।

৪২. ঐ, পৃ: ৯০।

৪৩. ঐ, পৃ: ৮৯।

৪৪. "বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক তালিকা অনুযায়ী গ্রন্থটির প্রকাশের তারিখ 11 May 1883 [শুক্র ২৯ বৈশাখ]..." — *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড, প্রশান্তকুমার পাল। পৃ: ১৭৪।

৪৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১২৯-৩০।

৪৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি: প্রথম পান্ডুলিপি, *রবীন্দ্রবীক্ষা* (রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের ষান্মাসিক সংকলন), সংখ্যা - ১৩, বিশ্বভারতী, ৭ আগস্ট ১৯৮৫।

৪৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মানব সত্য', *মানুষের ধর্ম*, *রবীন্দ্র রচনাবলী* - দ্বাদশ খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পৃ: ৬০৭।

৪৮. ঐ, পৃ: ৬০৬।

৪৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১২৯।

৫০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মানব সত্য', *মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী* - দ্বাদশ খন্ড। পৃ: ৬০৬।

৫১. ভূমিকা, *মানুষের ধর্ম*, ঐ।

৫২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *মানুষের ধর্ম*, ঐ, পৃ: ৫৬৯।

৫৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *আত্মপরিচয়* । পৃ: ২১।

৫৪. সূচনা, প্রভাত সংগীত, *রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬।

৫৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মানব সত্য', *মানুষের ধর্ম*। পৃ: ৬০৮।

৫৬. ঐ, পৃ: ৬০৯।

৫৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৫।

৫৮. ঐ, পৃ: ১৩২।

৫৯. ঐ, পৃ: ১৩৩।

৬০. বিশী, শ্রী প্রমথনাথ, *রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ*। পৃ: ৩৪-৩৫।

৬১. 'Many people had asked me "What is the Rabindranath Tagore's religion." At the end of my lecture I said, "I see only one way of explaining to you in a few words Tagore's religion. It is by quoting St. Thomas' definition of love: The hunger of Unity. Through Joy and through sorrow you will hear in his poemys the cry of that hunger of Unity." '— San Isidro, Dec. 1925.— A letter from Victoria Ocampo to Rabindranath Tagore. — *VICTORIA OCAMPO*, A cultural Bridge between Three continents — Krishna Kripalani. Tagore Research Institute. Calcutta. Second Edition. March 1982. p. 23.

৬২. সূচনা, *প্রভাত সংগীত, রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬।

৬৩. ঐ।

৬৪. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড। পৃ: ১৯২।

৬৫. গ্রন্থপরিচয়, *রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬।

৬৬. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* — প্রথম খন্ড। পৃ: ১৭০।

৬৭. ঐ। পৃ: ১৭১ - ৭২।

৬৮. ঐ। পৃ: ১৭৬।

৬৯. পাল, প্রশান্তকুমার, *রবিজীবনী* - ২য় খন্ড। পৃ: ১৮৪।

৭০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪৩।

৭১. ঐ। পৃ: ১৪৩।

৭২. ঐ।

৭৩. ঐ।

৭৪. ঐ। পৃ: ১৪৪।

৭৫. সূচনা, *ছবি ও গান*, *রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড, বিশ্বভারতী। জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৬।

৭৬. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* — প্রথম খন্ড। পৃ: ১৭৭।

৭৭. ঐ। পৃ: ১৭৮ - ৭৯।

৭৮. সূচনা, *চৈতালী কাব্য*, *রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৭৯. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* — প্রথম খন্ড। পৃ: ১৭৯।

৮০. " 'নিশীথ চেতনা'র সুর অন্যরূপ হইলেও ইহার মধ্যেও 'নিশীথ জগতে'র দূরতর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।" ঐ। পৃ: ১৭৫।

৮১. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা*, - প্রথম খন্ড, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সুবর্ণজয়ন্তী সংস্করণ: বৈশাখ ১৪০০। পৃ: ১৬।

৮২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৩৯।

৮৩. ঐ। পৃ: ১৪৩।

৮৪. সূচনা, *ছবি ও গান, রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড।

৮৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৫৭।

৮৬. ঐ।

৮৭. বসু, বুদ্ধদেব, *সঙ্গ: নি:সঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ,* প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৬৩। পৃ: ১৭৮-৭৯।

৮৮. ঐ। পৃ: ১৭৮ - ৭৯।

৮৯. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *রবীন্দ্রজীবনী* — প্রথম খন্ড। পৃ: ১২৩।

৯০. সূচনা, *প্রভাত সংগীত, রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড।

৯১. সূচনা, *বাল্মীকি প্রতিভা*। ঐ।

৯২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা, *রবীন্দ্র সাহিত্যের আদিপর্ব*। পৃ: ২৩৩।

৯৩. রায়, নীহাররঞ্জন, *রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা,* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রা: লি: পঞ্চম সংস্করণ ২২শে শ্রাবণ ১৩৬৯। পৃ: ৪৫।

৯৪. সূচনা, *প্রকৃতির প্রতিশোধ, রবীন্দ্র রচনাবলী* - প্রথম খন্ড।

৯৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *জীবনস্মৃতি*। পৃ: ১৪১।

৯৬. ঐ। পৃ: ১৩০।

৯৭. Eliot. T. S. 'Three voices of poetry' *On Poetry and Poets*. Faber & Faber. London. 1969.